পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এমাম, হেযবুত তওহীদ

পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সম্পাদনা ও অনুলিখনঃ রিয়াদুল হাসান

প্রচ্ছদঃ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী

প্রকাশনা ও পরিবেশনা

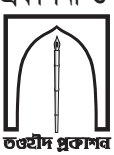

(বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একমাত্র পরিবেশক)

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১

www.hezbuttawheed.org

ফেসবুক: আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই; Let's change the system

ISBN: 978-984-8912-30-0

প্রকাশকাল : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঈসায়ী

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে দেশকে বাঁচাতে
গণমাধ্যমের করণীয়

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনসম্পৃক্ততার বিকল্প নেই কথাটি এখন প্রায় সবার মুখে মুখে। জনসম্পৃক্ততার প্রসঙ্গটি যখনই আসে তখনই একটি আদর্শের প্রয়োজন অনুভূত হয় যা দ্বারা জনগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে অনুপ্রাণিত করা, উদ্দীপ্ত করা যেতে পারে। আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার রণকৌশল থেকে যে জঙ্গিবাদের জন্ম হয়েছিল তাকে কেন্দ্রে পরিণত করে এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শুরু হয়ে গেছে। পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই অ্যাটম বোম, হাইড্রোজেন বোম ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য রাশিয়াকে প্ররোচিত করা হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে আমাদের দেশটিকে আমরা কীভাবে এই যুদ্ধ থেকে রক্ষা করতে পারি।

জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে জনগণের সামনে দুইটা জিনিস পরিষ্কার করতে হবে। একটা হলো এসব জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদের উদগাতা কারা, এর উৎপত্তি কোত্থেকে। শুধু অন্ধের মত ধর্মকে দোষারোপ করে লাভ হবে না। স্রষ্টার প্রেরিত কোনো ধর্মই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয় নি। ধর্ম যখন ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে বন্দী হয়ে গেছে, তারা যখন বাণিজ্যিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, ধর্মের অপব্যবহার করেছে, হারামকে হালাল, হালালকে হারাম করেছে, জাতির ক্ষতি, জনগণের ক্ষতি চিন্তা না করে ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠী স্বার্থে তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছে, তখন এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা। তাই আমরা বলব বর্তমানের যে জঙ্গিবাদ তা ধর্মব্যবসায়ী আর সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের সম্মিলিত রূপ। এটা জনগণের সামনে পরিষ্কার করতে হবে। জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি বা কর্তৃপক্ষই এখন আর দেশ রক্ষা করতে পারবে না। এজন্য সমস্যার গোড়াটা চিহ্নিত করে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

আরেকটা বিষয় গণমাধ্যম ও সরকারকে বুঝতে হবে যে আমাদের জনগণ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। তারা কোর'আন হাদিস, ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস করে। অল্পসংখ্যক লোক আছে তারা ধর্মের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। গণমাধ্যমগুলোকে অধিকাংশ লোকের মনোভাব ও বিশ্বাসকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করার মনোভাব পোষণ করা উচিত হবে না। গণমাধ্যমে যেভাবে ধর্মকে গুরুত্বহীনভাবে তুলে ধরতে দেখা যায় মনে হতে পারে যে, ধর্ম অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় একটি বিষয়। এর কারণ আমাদের মিডিয়া বানরের মতো পশ্চিমাদের অনুকরণকারী মাত্র। তারা একচেটিয়াভাবে ধর্মবিরোধিতা করছে এবং মানুষের দৃষ্টিকে আজ একদিকে, কাল আরেকদিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেশ যখন সংকটে তখন এভাবে ফোকাস পরিবর্তন করায় জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, সংকটটা দেখেও দেখছে না, যারা দেখছে তারা আবার পথ

পাচ্ছে না। এখন সময়টা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সংকটটি বিরাট। এটা নিয়ে হেলাফেলা না করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে ঐক্যবদ্ধ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

এখন সবাই মিলে জনগণকে বলতে হবে, আপনারা যে নির্বিকার থাকছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, ঘুমাচ্ছেন, আপনারা ভাবছেন জঙ্গিবাদ মোকাবেলা, দেশরক্ষা সরকারের দায়, পুলিশ আর সেনাবাহিনীর মাথাব্যথা? এ ধারণা ত্যাগ করুন। জনগণ হলো দেহ আর সরকার তার মাথা। সরকারের মাথাব্যথা হলে শরীরও সুস্থ থাকে না। তাই আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদেরকেও ভূমিকা রাখতে হবে, আমাদেরকেও চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষগুলোই মরছেন সিরিয়াতে-ইরাকে, তারাই স্বজন হারাচ্ছে, তাদের শিশু সন্তানদেরকেই হত্যা করা হচ্ছে, পানিতে ডোবানো হচ্ছে, নারীদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, সম্মানিত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, দেশ আক্রান্ত হলে আমরাই উদ্বাস্তু হব, অবরোধ দেওয়া হলে আমরাই না খেয়ে মরব। রাজনীতি যারা করছে তারাও মরে, তবে দুই চারজন স্বার্থপর পালিয়ে গিয়ে রাজনীতিক আশ্রয় পায়। কিন্তু আশ্রয় আশ্রয়ই, আশ্রিত কখনো মর্যাদা পায় না। সুতরাং আমাদের দেশ আক্রান্ত হলে আমরা যারা সাধারণ জনতা আমাদেরই যাবতীয় দুর্দশা পোহাতে হবে, আমাদের সব যাবে। আমাদের এক চিলতে দেশ সেটাও হারাব। আমাদের বংশধর বড় হবে শরণার্থী শিবিরে। এটা বাস্তবতা। সুতরাং জনগণ কেন সন্ত্রাস মোকাবেলায় সম্পৃক্ত হবে এটা তাদেরকে বুঝাতে হবে। তারা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ না গড়ে তুললে দেশটি পশ্চিমাদের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হবে।

জঙ্গিবাদ যেহেতু ধর্মীয় বিভ্রান্তি তাই এর বিরুদ্ধে জনগণকে ধর্ম দিয়েই বোঝাতে হবে। সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝালে হবে না। জঙ্গিরা তাদের কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে কোর'আন, হাদিস, ইতিহাস থেকে যুক্তি তুলে ধরে বলছে কোর'আনে কেতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) করতে বলা হয়েছে, সুতরাং সেটা করতে হবে। এখন মানুষের সামনে এটা তুলে ধরতে হবে যে, রসুল কেতাল করেছেন কিন্তু তিনি কখন করেছেন? তিনি যখন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তখন করেছেন। আমাদের দেশের জঙ্গিবাদীরা বিরুদ্ধ মতের মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করছে। অথচ তাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি নেই, সুতরাং তাদের এই কাজ তো রসুলাল্লাহর আদর্শ মোতাবেক হচ্ছে না। জেহাদ শব্দের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। জেহাদ মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। জঙ্গিরা নিজেরাই ইসলামের নীতি ভঙ্গ করে অন্যায় করছে, আবার সেই অন্যায়কে জেহাদ বলে প্রচার করছে। সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ জেহাদ কী, আল্লাহ ও রসুল কখন কীভাবে তা করতে বলেছেন সেটা নিজেরা বোঝে না; তাই বর্তমানে তাদের জন্য জেহাদের প্রেক্ষাপট আছে কিনা সেটাও তারা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না। তাদের এ অজ্ঞানতার কারণে তারা অতি সহজেই জঙ্গিদের কথায় প্রভাবিত হচ্ছে।

আমাদেরকে আজ প্রথমেই বুঝতে হবে যে, ধর্ম কোনো কঠিন বিষয় নয়। একে কঠিন বলে এড়িয়ে যাওয়ার বা একট সম্প্রদায়ের কাছে নিজের বিবেকবুদ্ধি সোপর্দ

করে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে সেরাতুল মোস্তাকীম অর্থাৎ সহজ সরল পথ, তিনি কোর'আনকেও বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছেন বলে কোর'আনে উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মের অপব্যাখ্যা করে একটি গোষ্ঠী যখন আমাদের অস্তিত্বকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তখন বুঝি না বলে বসে থাকলে হবে না।

ধর্ম সম্পর্কে সামগ্রিক একটি ধারণা আমাদের থাকতে হবে। অন্ধের হাতি দেখার মতো ধর্মকে অংশত যাবে না, চোখ খুলে পুরো ধর্মটাকে দেখতে হবে। এটাকে বলে আকিদা বা comprehensive concept। এই সামগ্রিক ধারণা না থাকলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই, ঠিক যেভাবে হাতির শুঁড় বা পা-কে ধরে সেটাকেই হাতি বলে বিশ্বাস করা অর্থহীন। আকিদা সঠিক হলে একজন মানুষ বুঝতে পারবে যে ইসলামের কোন কাজটা আগে, কোনটা পরে, কোনটা এখন, কোনটা তখন, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ। তারপর জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। মুসলিমরা নিজেরাই যখন শিয়া-সুন্নীতে মারামারি করছে সেখানে তারা কোন বিবেকে অমুসলিমদেরকে হত্যা করতে যাচ্ছে? তাদেরকে বোঝাতে হবে যে আগে তোমরা মুসলিম দাবিদাররা এক হও, সকল অন্যায়- অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও। তাহলেই তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাবে। তোমাদের ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের সূত্র ধরেই মধ্যপ্রাচ্য গুড়িয়ে দিচ্ছে, তোমরা ১৬০ কোটি হয়েও ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো মূল্যহীন। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে তোমরা সিরিয়া যাচ্ছ, আফগানিস্তান যাচ্ছ জেহাদ করতে? তোমার নিজের দেশকে আগে শান্তিমণ্ডিত করো, সত্যের পক্ষে আনো। সেটাই তোমার জেহাদ, সেটাই আসল এবাদত। এইভাবে মানুষকে ধর্মের প্রকৃত রূপ শিক্ষা দিতে হবে।

ইদানীং আমরা কাজ করার চেয়ে কথা বলায় বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ২৬-২৭ টা চ্যানেলে চলে টকশো। রাজনীতিক নেতারা সংসদে দাঁড়িয়ে, মঞ্চে উঠে জনগণকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু আহ্বানই সার, কেউ এগোয় না। কারণ আহ্বান এক জিনিস, বাস্তবতা আরেক জিনিস। এগিয়ে আসবে কি করে? একটা আদর্শ দ্বারা যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে এটা তো আহ্বানকারীদের ধারণাতেই নেই। সবাই তাদের পরিণতিকে নিয়তির উপর ছেড়ে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা কী খেলেন ঘরে বসে তারা সেটা দেখছেন। আমরা ঘরে বসে টিভি দেখি আর স্বার্থপরের মতো আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করি, আর সবাইকে আহ্বান জানাই কিন্তু নিজেই যাই না।

কাজেই গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আমাদের কথা হলো এটাই যে ফোকাস অন্য দিকে নিবেন না। ফোকাস এক দিকে দিতে হবে। আমরা অনেক সময় দেখি দেশে বৃহৎ কোনো সংকট চলাকালে হঠাৎ জাতির দৃষ্টিকে, ফোকাসকে স্বল্পগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেমন পৌরসভার নির্বাচনের দিকে নিবদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সকল গণমাধ্যম কয়েকদিন ধরে সেটা নিয়ে ব্যাপক মাতামাতি করে।

আমাদের এখানে বেশ গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে এটা দেখানোর জন্যই হয়তো এমন প্রচার। কিন্তু তাতে জাতির কতটুকু লাভ ক্ষতি হলো সেই হিসাব কেউ কি কষে দেখেছেন? নির্বাচন মানেই কোটি কোটি টাকার ছড়াছড়ি, তাই গণমাধ্যমগুলো বাণিজ্যিক স্বার্থে সেখানে হামলে পড়ছে। এটা ঠিক নয়, এতে জাতির সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা হয়, প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না।

আমাদের আরেকটি স্বভাব আছে যে সরকারপ্রধান কোনো কথা বললেই সেটাকে তাচ্ছিল্য করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, প্রধানমন্ত্রী তার উচ্চতর অবস্থানের কারণে যা দেখতে পান, যা জানতে পারেন তা আমরা জানতে পারি না। তাই অন্ধের মতো তার কথার বিরোধিতা করলে হবে না। তিনি বলেছেন, দেশকে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে, চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে রীতিমত। স্বীকার করলেই পশ্চিমারা উড়ে আসবে, সহযোগিতার নাম করে দেশ দখল করে নেবে। এখন তো এ সংকট দৃশ্যমান। আমাদের জনগণ যত দ্রুত এই সংকটটি বুঝতে পেরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে ততই আমরা নিরাপদ হব। এটা কীভাবে করা যাবে তা আমাদের কাছে আছে। আপনারা সেটা দেখুন, বিবেচনা করুন এবং জাতিকে রক্ষা করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

শুভেচ্ছান্তে,

(মসীহ উর রহমান)
আমীর, হেযবুত তওহীদ
উপদেষ্টা, দৈনিক বজ্রশক্তি
চেয়ারম্যান, জেটিভি অনলাইন
আহ্বায়ক, বাংলাদেশ অনলাইন টেলিভিশন অ্যাসোসিয়েশন (BOTA)

সূচিপত্র

১. পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ আর নয় ১৫
➪ সত্য সত্যই, মিথ্যা মিথ্যাই ১৯
➪ একটি অন্যায় শত অন্যায়ের জন্ম দেয় ১৯
➪ জ্ঞানীর মৌনতা মুর্খের পাপ থেকেও বড় অপরাধ ২০
২. মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে ২০
৩. নৈতিক অবক্ষয়ের নেপথ্যে: ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা ২৭
৪. গণতন্ত্রের নামে যা চলছে ৩১
➪ মিডিয়ার উচিত হুজুগ সৃষ্টি না করে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা ৩২
➪ ইহুদি চক্রান্ত মোতাবেক প্রেস ও সংবাদপত্রের ভূমিকা ৩৪
৫. মানুষকে ধর্মহীন করার প্রচেষ্টা সফল হয় নি কেন? ৩৬
৬. টাইম বোমা, নূহের (আ.) নৌকা ও মায়ের জীবন রক্ষা ৩৯
৭. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলাদেশ ৪২
৮. হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্যের ধরণ ৪৯
➪ আমাদের আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি ৪৯
➪ সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য ৪৯
➪ আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৫০
➪ কাঠামো ৫১
➪ ঐকমত্য পোষণ করার প্রক্রিয়া ৫১
➪ আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ধরন ৫১
➪ আমাদের সম্পর্কে লেখার আগে তথ্যটা যাচাই করে নিন ৫৫
➪ মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টাই আমাদের অনন্যতা ৫৫
➪ হেযবুত তওহীদের কিছু মৌলিক নীতি ৫৭
৯. রাজনীতিকরা ভুল ব্যবস্থার কারণে চরিত্র হারাচ্ছেন ৫৯
১০. ধর্ম কখনো শিল্পচর্চার পথ রুদ্ধ করে না ৬১
১১. নারী নিয়ে আধুনিকতা ও ধর্মের টানাপড়েন ৬৩
➪ নারী পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য ও তাদের দায়িত্ব ৬৩
➪ জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা ৬৪
➪ প্রকৃত ইসলামের নারী ৬৪

➪ ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি করা নারী ৬৫
➪ পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি করা নারী ৬৫
➪ নারীর মর্যাদা কী, অধিকার কী? ৬৬
➪ হেযবুত তওহীদের নারীরা ৬৮
১২. প্রচলিত ইসলাম আর প্রকৃত ইসলামের উদ্দেশ্যের তফাৎ ৬৯
➪ প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফল কী ছিল ৭০
➪ হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের অপপ্রচার ৭১
১৩. পশ্চিমা সমাজে কেন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা গৃহীত হলো?
আমাদের সমাজে কেন হচ্ছে না? ৭৩
১৪. স্বদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা ও মদীনা সনদের প্রসঙ্গ ৮৪
১৫. ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি অপরিহার্য ৮৯
১৬. রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের যোগ কী করে সম্ভব? ৯৩
১৭. শেষ কথা ৯৬

৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ রাজধানীর বাসাবো বালুর মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন লেখক, হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

রাজধানীর হাজারীবাগ পার্ক ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখছেন লেখক।
(১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভি.আই.পি. লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন লেখক
(২৯ জানুয়ারি ২০১৬)

পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ আর নয়

যে পাশ্চাত্য দুনিয়া বর্তমান বিশ্বের অধিপতি তারা আজ থেকে ৩/৪ শত বছর আগে পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকাকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। সেই সময় তারা বিশ্বকে শাসনের নামে শোষণ করে সমুদয় সম্পদ ইউরোপে নিয়ে জমা করেছে। একদা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষের তিন কোটি মানুষ ব্রিটিশ শাসনের শেষার্ধে না খেয়ে মারা গেছে। কিন্তু সেই শোষণ নিপীড়নের কথা আমরা জাতিগতভাবে বেমালুম ভুলে গেছি। আজকের উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া সেই ইউরোপেরই সম্প্রসারিত অংশ যদিও এক সময় সেগুলোও ব্রিটিশ কলোনি ছিল। সেখানকার আদিবাসীদেরকে কীভাবে নির্মূল করা হয়েছিল তা পাঠ করলে কঠোরহৃদয় মানুষও অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না।

উপনিবেশ যুগের সীমাহীন শোষণের ফলে পাশ্চাত্য জগৎ হয়ে গেল উন্নত ধনী বিশ্ব, আর এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলো হয়ে গেলো অনুন্নত, পশ্চাৎপদ তৃতীয় বিশ্ব যাদের অতুল সম্পদরাশি লুট করার জন্য তারা এসেছিল বণিকের বেশে। তারাই আজ এই আমাদেরকে বাথরুম সেরে হাত ধোয়ার উপকারিতা শেখায়। আমাদের কোটি কোটি প্রাণ ভাতের অভাবে মন্বন্তরে মরার পর গত একশ বছরে আমরা কেবল ভাগ্যোন্নয়ন, ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভৌগোলিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছি, কিন্তু পেরে উঠছি না। কারণ পশ্চিমাদের শোষণ এখনো চলছে, তবে ভিন্নরূপে। শোষণ বন্ধ হয় নি, কেবল নকশা পাল্টেছে। ঋণের শিকল দিন দিন আরো মজবুত হয়ে আমাদের কণ্ঠকে আলিঙ্গন করছে। ওদিকে এই একশ বছরে ইউরোপ জ্ঞান বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে এত বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছে যে বাকি দুনিয়ার পক্ষে তাদের উপর নির্ভরশীল ও অনুগামী হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। পশ্চিমারা এমন এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে যে এই উন্নয়নশীল দেশের মানুষগুলো সে প্রযুক্তি বোঝার বা ব্যবহার করারও যোগ্যতা রাখে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদের সামরিক শক্তি যে কোন পর্যায় গেছে তা আমরা ভাবতেও পারব না।

এবার আসুন মিডিয়া প্রসঙ্গে। এই ১০০ বছরে তারা নিজেদের গণমাধ্যমকে অত্যন্ত শক্তিশালী বানিয়ে ফেলল। কাগজ উৎপাদন, ছাপাখানা (মুদ্রণপ্রযুক্তি), সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা এতটাই অগ্রসর হলো যে যখন তাদের দেশের কোনো বুলেটিন বা গেজেট লক্ষ লক্ষ কপি প্রকাশ হতো, তখন এদেশের অভিজাত পরিবারের সদস্য বা ক্ষমতাধর দু' চারজন ব্যক্তি বিলেত-আমেরিকা থেকে পত্রিকা এনে পড়তে পারতেন। আজকের পৃথিবীতে সাংবাদিকতার যে রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার গোড়াপত্তন কিন্তু সেখান থেকে।

বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্তি ও প্রাধান্য লাভ করতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। সে তিনটি হল: অর্থবল (Finance), প্রচারমাধ্যম (Media) ও সামরিক শক্তি (Military might)। এই তিনটি যার হাতে থাকবে সেই পৃথিবীর কর্তৃত্ব করতে

পারবে। এ কথা সবারই জানা যে এই তিনটিই বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতের অর্থাৎ জুডিও খ্রিষ্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালের হাতে।

এই পাশ্চাত্য জগৎ সমস্ত পৃথিবীর অর্থবল (Finance) ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামরিক শক্তিতে তো কথাই নেই। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির মিডিয়া অর্থাৎ গণমাধ্যমের সর্বপ্রকার সংবাদ ইত্যাদির উৎস হল উন্নত দেশ অর্থাৎ পশ্চিমা শক্তিগুলির সংবাদ সংস্থাগুলি। সুতরাং সেই উৎস থেকে যে সংবাদ, আদর্শ, অভিমত পরিবেশন করা হয় উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত জগতের মিডিয়া নিজেরা তাই দিয়ে প্রভাবিত হয় এবং তাদের নিজ নিজ দেশের গণমাধ্যমগুলিতে তা-ই প্রচার করে। পশ্চিমের এই সংবাদ সংস্থাগুলি সম্পূর্ণভাবে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। ইহুদিরা যে মতবাদ বিশ্বময় প্রচার করতে চায়, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সংবাদমাধ্যমগুলি সেই মতবাদই প্রচার করে। ঐ সংস্থাগুলি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল জগতের মানুষকে যা ভাবাতে, যা চিন্তা করাতে চায়, গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে তা-ই ভাবায়, যে মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায়, তাই সৃষ্টি করে এবং যা বিশ্বাস করাতে চায় তাই বিশ্বাস করায়। এভাবে পশ্চিমা জগৎ প্রাচ্যের মানুষের চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু তাই নয়, তথাকথিত উন্নত দেশগুলির পদাঙ্ক অনুসারী, অনুগত মিডিয়া বর্তমানে এতই শক্তিশালী (Powerful) যে, মিডিয়া রক্তচক্ষু দেখালে বা ধমক দিলেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারের কাপড় চোপড় বদলাতে (Shit in the pants) হয়।

অর্থবল (Finance), প্রচারমাধ্যম (Media) ও সামরিক শক্তি (Military might) এই তিনটি শক্তিই আজ জুডিও খ্রিষ্টান সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্যের হাতে অর্থাৎ দাজ্জালের হাতে। আখেরি যামানায় দাজ্জাল আসবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সকলেই জানেন। এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী রসুলাল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী, বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন বর্তমানের পাশ্চাত্য ভোগবাদী, বস্তুবাদী সভ্যতা যাকে 'ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা' বলা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে সেই এক চোখা দানব দাজ্জাল। এ বিষয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন যা ২০০৮ সনে বাংলাদেশে বেস্ট সেলার হয়েছিল।

যাই হোক, অর্থবল, মিডিয়া আর সামরিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে দাজ্জাল সমস্ত পৃথিবীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যে পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে সে তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে না। এই অবস্থার কথাই আল্লাহর রসুল চৌদ্দশ' বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছেন, দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন করবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মতো তার করায়ত্ত হবে (হাদিস, মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর)। আজ এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

দাজ্জাল নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া, গণমাধ্যমের অবিশ্রান্ত, নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচারের ফলে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি, যার মধ্যে কোনো কোনো দেশের ৯৮% মুসলিম, তারা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জালের সৃষ্ট জীবনব্যবস্থা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ করেছে এবং ফলে তারা অন্যায়, অশান্তি, অবিচার, নানাবিধ সংঘর্ষে, রক্তপাতে নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করছে।

দাজ্জাল কীভাবে তার গণমাধ্যমকে সাম্রাজ্যবিস্তারে কাজে লাগাচ্ছে তার একটি উদাহরণ ইরাক। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই অভিযোগ তুলেছিল পাশ্চাত্য শক্তি। আসল উদ্দেশ্য ছিল সাদ্দাম হোসেনকে শায়েস্তা করা ও ইরাক দখল করা। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমেরিকা ও পশ্চিমাবিশ্ব একযোগে প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রপাগান্ডা শুরু করল। বিখ্যাত বিখ্যাত গণমাধ্যমগুলো বিবিসি, সিএনএন, ফক্স নিউজ, গার্ডিয়ান, ইকোনোমিস্ট, ওয়াশিংটন পোস্ট, টাইমস, এ.পি., রয়টার্স ইত্যাদি সকল সংবাদ সংস্থা ও গণমাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল সাদ্দাম হোসেন। ভাবে মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত অশান্তি, সন্ত্রাস, হানাহানি, দুঃখ, যন্ত্রণার মূল কারণ সাদ্দাম। টকশো-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ সবখানে শুধু সাদ্দাম। এক কথায় পৃথিবীর তাবৎ মানুষের দৃষ্টি ইরাকের দিকে ঘুরিয়ে দিল যেন তারা সবাই সাদ্দাম সরকারকে ঘৃণা করে।

তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। একটি সরকার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল, হাজার বছরের ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতার ক্ষেত্র ইরাক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো, ১০ লাখ বনি আদম (মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, নাস্তিক, পারসিক) মাটির সাথে মিশে গেল। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের খনিজ সম্পদ বোমার আঘাতে ধ্বংস হলো, লুট হলো। এখন ইরাক এক মৃত্যুপুরি যেখানে সর্বদা আতঙ্ক বিরাজ করে, বিভিন্ন নামের জঙ্গি গোষ্ঠীর অভয়ারণ্য। যে কোনো মুহূর্তে বোমার আঘাতে মানুষ নিহত হয়। আর এই ঘটনার নায়ক জর্জ বুশ হোয়াইট হাউজে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমাদের গোয়েন্দা রিপোর্টে ভুল ছিল। তার বিশ্বস্ত অনুচর টনি ব্লেয়ার বলেন, 'ইরাক আক্রমণ আমাদের ভুল ছিল।' 'ভুল ছিল' - এই একটি স্বীকারোক্তিতে সব ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড জায়েজ হয়ে গেল।

কিন্তু এই 'সামান্য ভুল'-এর খেসারত দিতে গিয়ে নির্মম পরিণতি নেমে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যা সেই এলাকা থেকে ক্রমশ চতুর্পার্শ্বে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সিরিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ইউরোপের দেশগুলোতে পথে পথে ঘুরছে। সেখানে তাদের মানবেতর জীবের মতো ঘৃণা বিদ্বেষের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। বিশ্বনেতাদের 'ভুলের' পরিণামেই জন্ম হয়েছে আইএস-এর। ব্রিটিশ নেতা জেরেমি করবিন বলেছেন, 'আই.এস. আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি।' 'সাদ্দাম হোসেন উৎখাতে ইরাক আক্রমণের ফলেই আইএস সৃষ্টি হয়েছে'- বলে মন্তব্য করেছেন আমেরিকার সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান রন পল। এমনকি

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, 'আইএস উত্থানে বুশ দায়ী'। (আমাদের সময়.কম : ১৫/১১/২০১৫)

একই সত্য আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন সব দেশের বেলায় প্রযোজ্য। বলতে গেলে শুধুই কলেবর বৃদ্ধি পাবে।

যাই হোক, যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের মিডিয়াকে মনে রাখতে হবে আমাদের দেশটি উন্নয়নশীল দেশ। ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষত আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি। এখনো এখানে দারিদ্র্য দূরীকরণের লড়াই চলছে, আমরা সবেমাত্র মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। ১৯৭১ সনে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল। এখানে আমাদের বড় সংকট জাতীয় ঐক্য। স্বাধীনতার ৪৪ বছরে একদিনের জন্যও জাতিটিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে দেয় নি। এখানে সেই পশ্চিমারা যাকে ফোকাস করবে তাদের দেখাদেখি আমরাও তা ফোকাস করব, তারা যেটাকে সমাধান বলবে আমরাও সেটাকেই সমাধান মনে করব এই অন্ধ অনুকরণের নীতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় আমাদের মেরুদণ্ড কোনোদিনও ঋজু হবে না, আমাদের স্বাধীনতাও অর্থপূর্ণ হবে না। অনেকে বলতে পারেন যে বর্তমান যুগে বিশ্ব একটি গ্রামের মত। বিশ্বব্যবস্থার বাইরে আমরা চলতে পারব না। আমরা বলব তা সত্ত্বেও আমাদের ভুললে চলবে না যে পুঁজিবাদী, ভোগবাদী, বস্তুবাদী, যুদ্ধোন্মাদ পশ্চিমা দানব (Giant) মানবজাতিকে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে প্রায় ১৩ কোটি বনি আদমকে হত্যা করেছিল। সেই থেকে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, সংঘাত, রক্তপাত একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নি। **উইকিপিডিয়ার হিসাব অনুযায়ী গত একশত ১৫ বছরে বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত হয়েছে ১৭,৪৯,১৬,৫৩৩ (সতের কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশত তেত্রিশ) জন আদম সন্তান। আহত বিকলাঙ্গ হবে অন্তত এর ৪ গুণ অর্থাৎ প্রায় ৭০ কোটি।** জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার সর্বশেষ হিসাবমতে এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৬ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ এদের কোনো বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি, বাস্তুভিটা কিছুই নেই। এরা পথে ঘাটে আশ্রয়হীন জীবনযাপন করছে অথবা শরণার্থী শিবিরে ত্রাণের আশায় প্রহর গুনছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রতিটি যুদ্ধ বাঁধিয়েছে কারা, অস্ত্র যুগিয়েছে, ইন্ধন দিয়েছে কারা?

নিশ্চয়ই বর্তমানের জঙ্গিরা নয় বরং যারা এই জঙ্গিদের সৃষ্টি করেছে এবং লালন করে চলেছে তারাই। অর্থাৎ পশ্চিমা ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' তথা দাজ্জাল। এ তো গেল গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধের হিসাব। কিন্তু প্রতিটি দেশে সারা বছরব্যাপী প্রতিদিন ঘটে চলা অভ্যন্তরীণ অশান্তি অর্থাৎ খুন, নির্যাতন, গুম, ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি, দুর্নীতি, লুটপাট, জবরদস্তি, খাদ্যে ভেজাল, মাদক সেবন, প্রতারণা, রাজনীতিক ধান্ধাবাজি কী পরিমাণ চলছে, কীভাবে তা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তা যে কোনো দিনের পত্রিকায় দেখলেই বোঝা যায়। এক কথায় এ এক জাহান্নাম। যে কোনো ধর্মগ্রন্থে দেওয়া জাহান্নামের বিবরণের সঙ্গে এই

পরিস্থিতি মিলে যায়। তারাই গণতন্ত্র, মানবতা, বাক-স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি চাতুর্যপূর্ণ শব্দ আউড়িয়ে ভালো মানুষ সেজেছে। অথচ তাদেরই লোভের পরিণামে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, জলরাশি, মাটি এক কথায় প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করেছে। মানবজাতি আবার আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। ভয়, আতঙ্ক আর ত্রাস ঘিরে ধরেছে প্রতিটি দেশকে। এখনই যদি আমরা এই অন্যায়কে চিহ্নিত না করি তবে যদি যুদ্ধ মহাযুদ্ধ করতে করতে সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়, সেই ধ্বংস থেকে এই জাতিও অর্থাৎ আমরাও বাঁচতে পারব না। তাদের চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি মানবজাতিকে কল্যাণ দেবে এই ধারণা নিয়ে যারা এখনো দিন গুনছেন তারা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছেন।

সত্য সত্যই, মিথ্যা মিথ্যাই

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমাদের পথ চলার, সিদ্ধান্তের নীতি (Principle) কী হওয়া উচিত। আমাদের সেই চিরন্তন, সনাতন, চির সত্য নীতি গ্রহণ করতে হবে। সেটা হচ্ছে- যা সত্য সত্যই, যা মিথ্যা মিথ্যাই। পশ্চিমাদের অন্ধ আনুগত্য পরিহার করতে হবে এবং নিজেদের জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে সত্যের ভিত্তিতে পথ চলতে হবে, সত্য ও ন্যায়কে ভালোবাসতে হবে, ধারণ করতে হবে। কারণ সত্য কখনো বঞ্চনা করে না, সত্যের ফল শুভ হয়। সেই সত্য হলো স্রষ্টার দেওয়া নিখুঁত ও ভারসাম্যযুক্ত জীবনব্যবস্থা।

তাই অসৎ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিলের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করে, সত্যের কোনো ছিটেফোঁটাও নেই সেখান তা দিয়ে সংবাদ তৈরি করা, তিলকে তাল করা, এমন কি যেখানে তিলও নেই সেটাকেও স্বার্থের প্রয়োজনে তাল বানিয়ে ফেলা, শব্দ বাক্যের চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা ভালোকে মন্দ বানিয়ে ফেলা যাবে না। এই প্রবণতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শুধু আইন করে সংবাদ মাধ্যমগুলোকে পরিচ্ছন্ন ও মিথ্যামুক্ত রাখা যাবে না। আমাদের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট আছে, তথাপি নতুন নতুন ফাঁক ফোকর খুঁজে তা ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সেগুলো বন্ধ করতে আরো বহু আইন, ধারা উপধারা তৈরি করা হয়েছে। তবু সাংবাদিকদেরকে জনগণ সুযোগসন্ধানী বলেই মনে করছে।

একটি অন্যায় শত অন্যায়ের জন্ম দেয়

এটি শুধুমাত্র ধর্মের আপ্তবাক্য নয়, এটি প্রাকৃতিক সত্য যে একটি মিথ্যা শত শত মিথ্যা ও অন্যায়ের জন্ম দেয়। একটি সমাজে যখন মিথ্যা চলতে থাকে আর অন্য সচেতন মানুষগুলো সেই মিথ্যাকে প্রমোট করে তখন সমাজে মিথ্যা আসুরিক রূপ নিয়ে সবাইকে গ্রাস করে, আজ নয়তো কাল। মিথ্যার একটি বিষধর সাপ, তাকে দুধ কলা দিয়ে যতই প্রতিপালন করা হোক, একটা সময় সে তার প্রভুকেও ছোবল

দিতে ছাড়ে না। হয় আজ নয় কাল।

জ্ঞানীর মৌনতা মূর্খের পাপ থেকেও বড় অপরাধ

যারা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি তারা জীবনের বিরাট সময় জুড়ে অতি কষ্ট ও সাধনা করে লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু একটা কথা তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যে জ্ঞান সমাজের বা জাতির কল্যাণে লাগে না সেই জ্ঞান অর্থহীন। আর অসৎ ব্যক্তির জ্ঞান বিষমাত্র, যা মানুষের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। সে কারণে আজকে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির দ্বারাই দেশ ও মানুষের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ঘৃণ্য অপরাধীর যাবতীয় অপরাধের চেয়ে জ্ঞানীর মৌনতা বড় অপরাধ। নির্বিবাদী জ্ঞানীরাই আল্লাহর চোখে বড় অপরাধী, কোর'আনের ভাষায় মুজরিমুন।

আজ আমাদের সমাজের জ্ঞানী লোকেরা মানবজাতির দুঃখ, দুর্দশা, মনুষ্যত্বের অপমান-লাঞ্ছনা দেখেও না দেখার ভান করে নীরবে ঘর-সংসার করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাদের এই নীরবতাই তাদের ও সমগ্র সমাজের ধ্বংসের কারণ হবে এবং এই ধ্বংস কেবল এই জগতে নয়, পরজগতেও। যারা গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রতি আহ্বান, আপনারা কলমের আঘাতে জাতির বিবেককে জাগিয়ে তুলুন, মৌন জ্ঞানীকে জাগ্রত করুন। তাদেরকে বোঝান যে জ্ঞানী হওয়া অহমিকা, আত্মম্ভরিতার বিষয় নয় বরং তা দেশ ও সমাজের জন্য দায়বদ্ধতার বিষয়। কারণ যাকে আল্লাহ শক্তি, জ্ঞান ও অর্থ দিয়েছেন সমাজের মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করা তার অবশ্য কর্তব্য (ফরদ)। রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ মানুষকে উপকৃত করেন সেই জ্ঞান যার আছে সে যদি মৌনতা অবলম্বন করে, মানুষের কাছে প্রদান না করে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিবসে আগুনের লাগাম পরাবেন।' (ইবনে মাজাহ)

মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামকে টার্গেট করেছে। তাদের শত্রু হতে কারো আর ইসলামের অনুরাগী হওয়ার দরকার নেই, নামে বা বংশ পরিচয়ে মুসলিম হলেও তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না।

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনা হচ্ছে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ। কোটি কোটি মানুষ আহত-নিহত-গৃহহীন হওয়া ছাড়াও প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে, গোটা বিশ্বের উপর তাদের অসম্ভব শক্তিশালী প্রভুত্ব কায়েম হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কয়েক দশক পর্যন্ত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং ব্রিটেন-আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্লকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) চলেছে। এই সময়ে তারা উভয়পক্ষ কী পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র মজুদ করেছে তা ভাবলে বিবেকবান মানুষ শিউরে উঠতে বাধ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটাকে সেগুলো দিয়ে অনেকবার ভেঙ্গে দেয়া যায়।

ভেঙ্গে যে আজও দেয় নি তার কারণ এই সভ্যতা নয়, নর নারী শিশু পশু সব নিহত হবে এ কোমল মানবিক বৃত্তিও নয়, কারণ ভয়। ভয় যে শত্রুর সঙ্গে সে নিজেও যাবে। যুক্তরাষ্ট্র জানে সে যদি তার শত্রু সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে চায় তবে যতক্ষণে তার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (I.C.B.M.) রাশিয়াতে পৌঁছে রাশিয়ার নর নারী শিশুদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে, ততক্ষণে রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্রও আমেরিকার দিকে অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে আসবে এবং আমেরিকারও ঠিক সেই দশাই ঘটবে। রাশিয়াও জানে, সে যদি আমেরিকাকে ধ্বংস করতে চায় তবে তারও ঠিক তেমনি দশাই হবে। মানবতা নয়, দয়া নয়, ন্যায়ের প্রতি সম্মান নয়, অন্যায়ের প্রতি বিরূপতা নয়, কত কোটি মানুষ, শিশু পশু নিহত হবে, এ অনুভূতিও নয়- শুধু ভয়, শত্রুকে মারলে আমিও মরব। মানবতা ও ন্যায়ের খাতিরে যে এই হত্যাযজ্ঞ থেকে এরা বিরত নয় তার প্রমাণ নাগাসাকি ও হিরোশিমা। নিজের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে। যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই নাম (Deterent), দা'তাত। যে মুহূর্তে রাশিয়া বা আমেরিকা নিশ্চিতভাবে বুঝবে, যে যান্ত্রিক প্রগতিতে আমরা এতদূর এগিয়েছি, এমন অস্ত্র তৈরি করতে পেরেছি যে শত্রুর আঘাত আমি সম্পূর্ণভাবে ঠেকাতে পারব এবং আমার আঘাতকে সে ঠেকাতে পারবে না সে মুহূর্তে সে শত্রুকে আঘাত হানবে। কোন ন্যায়-অন্যায় বোধ, কোন দয়া-মায়া-মমতা তাদেরকে এতটুকু দেরি করাতে পারবে না। এটা আজ আর কোন গোপনীয় কথা নয় যে, শত্রুর শক্তিই পৃথিবীর ছোট বড় রাষ্ট্রগুলিকে প্রলয়ংকরী যুদ্ধ শুরু করা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে দা'তাত (Deterent) কিছু নয়- আমাদের সামরিক শক্তিই হচ্ছে শান্তির সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। অর্থাৎ সোজা কথায় আমেরিকা পারমাণবিক ইত্যাদি শক্তিতে যতক্ষণ ততটুকু শক্তিশালী থাকবে যে, তাকে আঘাত করলে আঘাতকারীকেও মরতে হবে, শুধু ততক্ষণই আমেরিকা নিরাপদ। উল্টো দিকে রাশিয়ার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

দু'জনে দু'জনের বুকের উপর বন্দুক নিশানা করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ট্রিগার টিপছে না শুধু এই কারণে যে একজন ট্রিগার টিপলে অন্যজনও টিপবে। আর দু'জনেই শেষ হবে। শুধু ভয়ের উপর ভিত্তি করে আজ যে মানুষ বলে জাতিটা কোন মতে বেঁচে আছে এটাকে যদি কেউ সভ্যতা বলে অভিহিত করে তবে তার সাথে আমি একমত নই। এ তো সভ্যতা নয়ই শুধু একটি যান্ত্রিক প্রগতি এবং এমনি অবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চোলতে পারে না। মানুষ যদি এখনও না বুঝে যে তার এ আত্মাহীন যান্ত্রিক (Technology) প্রগতির পথ ছেড়ে তারা এই যান্ত্রিক জ্ঞান মানুষের কল্যাণের কাজে লাগাতে হবে, তার আত্মাকে উন্নত করতে হবে এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন ভাবে গড়তে হবে। তবে আজ হোক আর কাল হোক বন্দুকের ট্রিগার একজনকে টিপতেই হবে। অবশ্য

ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যা শুরু হয়েছে এবং এর শেষ পরিণতি কী তা বিশ্ববাসী অচিরেই প্রত্যক্ষ করবে।

যাহোক, যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কমিউনিস্ট ভিয়েতনামে আমেরিকা চরম মার খাওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছিল। এর সুযোগ এলো আফগান-রাশিয়ার যুদ্ধে। এই যুদ্ধে রাশিয়াকে এক হাত দেখে নেওয়ার জন্য আরবের ধনকুবের ধর্মব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় আমেরিকা-ব্রিটেন জোট আল কায়েদা ও তালেবানের মতো ধর্মীয় মৌলবাদী দল গড়ে তুলল। একে একটি ধর্মীয় রূপ দান করল। ইসলামের খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলে দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ তরুণ-যুবককে এনে আফগানে জড়ো করা হলো। পেছন থেকে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র, অর্থ, ট্রেনিং, পরামর্শ, গোয়েন্দা তথ্য সব দিল। রাশিয়া এই ধকল সইতে না পেরে ভেঙ্গে গেল আর যুক্তরাষ্ট্র হয়ে গেল একক পরাশক্তি।

পুঁজিবাদী ব্লক দেখল যে তাদের বিশ্বজোড়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিটি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। এদিকে ধর্মীয় জাগরণের একটি স্পন্দন ভিতরে ভিতরে মুসলিম জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মৃত জাতিটিকে আবার মাথা তোলার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। মুসলিমদের উত্থানের আশু সম্ভাবনা পশ্চিমাদের ভাবিয়ে তুলল। তারা প্রতিপক্ষ হিসাবে নিশানা তাক করল ইসলামের দিকে। তারা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখল যে, গণতন্ত্রের বিপরীতে একমাত্র মুসলিমদের কাছেই একটি জীবনব্যবস্থা আছে যা দিয়ে সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করা যায়, সমাজতন্ত্র তো মরেই গেছে। টার্গেট ঠিক করার আরেকটি কারণ মুসলিমদের অধীনে থাকা বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা অচল, সে সম্পদগুলো কুক্ষিগত করা।

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিমদের একটি চরমপন্থী গোষ্ঠী আফগান যুদ্ধের পর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত হতে থাকে। এই ক্ষুদ্র অংশটিরও ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক আকিদা নেই, তারা ইসলামের নামে ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী। ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশে পশ্চিমাদের বোমার আঘাতে যারা সব হারিয়েছে তাদের অনেকেই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে এই জঙ্গি দলগুলোয় যোগ দিয়ে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকারীরা তো এই সবগুলো দলেরই স্রষ্টা, তারা ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা এই জঙ্গিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য যাতে করে এই মুসলিম জাতিটিকে সন্ত্রাসী বানিয়ে দেওয়া যায় এবং সন্ত্রাস দমনের ওসিলায় মুসলিমদের ভূখণ্ড ও সম্পদ দখল করে নেওয়া যাবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমানের একটি উক্তিই যথেষ্ট হবে আশা করি। তিনি ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "তথাকথিত

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' সূচনা করে মুসলিম বিশ্বকে পদানত রাখার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে। দেশটি আফগানিস্তানে যুদ্ধের সূচনা করে, তা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে।" এ যুদ্ধে পক্ষে-বিপক্ষে মুসলিম দাবিদারদেরকেই ব্যবহার করা হচ্ছে অবিশ্বাস্য কূটকৌশলে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এ এক ভয়াবহ নীতি।

জঙ্গিরা যেটুকু সামরিক শক্তি অর্জন করেছে তা পশ্চিমাদের শক্তির সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনার যোগ্য নয়। তাদের অনেকেই আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে ও দীনুল ইসলামকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, আর তাই তারা পশ্চিমাদের অন্যায়গুলোকে মেনে নিতে রাজি নন, তারা প্রচলিত ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে এরা জানেন না প্রকৃত ইসলাম কী, এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রক্রিয়া কী। পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর পৃথিবীব্যাপী মহাশক্তির বিরুদ্ধে এরা অসহায়। পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রযুক্তি (Technology), অসংখ্য বোমারু বিমান, অসংখ্য ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই নেই। তাই তারা মরিয়া হয়ে এখানে ওখানে বোমা মেরে, পর্যটন কেন্দ্রে, বাসে ট্রেনে, পাতাল রেলে হামলা করে শত্রুর ক্ষতি সাধন করতে চাইছেন।

আল্লাহ, রসুল ও ইসলামের জন্য এরা এমন উৎসর্গীকৃত যে তারা শরীরে বোমা বেঁধে তা ফাটিয়ে শত্রু হত্যা করতে চেষ্টা করছেন। তারা বুঝছেন না ইসলাম প্রতিষ্ঠার এগুলো সঠিক পথ নয়, এগুলো করে জান্নাতেও যাওয়া যাবে না। সমস্ত পৃথিবী যার হাতে, 'মুসলিম' নামসর্বস্ব জনসংখ্যাসহ সমস্ত মানবজাতি যার পায়ে সাজদায় প্রণত সে মহাশক্তিধর দানবের এতে কিছুই হবে না। কিছু তো হবে না-ই বরং তার লাভ হবে এবং হচ্ছে। এদেরকে 'সন্ত্রাসী' (Terrorist), 'মৌলবাদী' (Fundamentalist), 'চরমপন্থী' (Extremist), 'জঙ্গি' (Militant) ইত্যাদি বহুবিধ নামে আখ্যায়িত করে পশ্চিমা সভ্যতা 'মুসলিম' জনসংখ্যাসহ সমস্ত মানবজাতিকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। এই মুসলিম জনসংখ্যার মহা-মুসুল্লীগণও যারা পশ্চিমা সভ্যতার পায়ে সাজদায় পড়ে আছেন তারা এই 'সন্ত্রাসীদের' বিরুদ্ধে, তাদের তারা ঘৃণা করেন। কারণ এই জঙ্গিবাদীরা এতই বোকার হদ্দ, মূর্খ, অন্ধ যে হামলা করে তারা অধিকাংশ সময় হত্যা করছেন মুসলিম অর্থাৎ নিজেদেরই লোক, ধ্বংস করছে নিজেদেরই দেশের সম্পদ, স্থাপনা, যার ফলে নিজ জাতির মধ্যেই তারা ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছেন।

এখানে আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কে দুটো কথা বলা দরকার। প্রকৃতপক্ষে সুইসাইড বম্বিং বা জঙ্গিবাদীদের কোনো পদ্ধতিই ইসলামের কোনো উপকারে আসে না, ইসলামসম্মতও নয় এবং এগুলো দ্বারা মহাশক্তিধর প্রতিপক্ষেরও কোনো বিশেষ ক্ষতি সাধন হয় না। উল্টো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনোভাব সৃষ্টিতে এই বিষয়টি খুবই কার্যকরি একটি অভিযোগ। একে আশ্রয় করে পশ্চিমাবিশ্বই লাভবান হয়, সাম্রাজ্য বিস্তার করে, বিশ্বকে ত্রাসিত করে রাখে। সুইসাইড বোমা

হামলার গোড়া সম্পর্কে ইসরাইল সাহাকের একটি লেখা থেকে কিছু অংশ পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি জেরুজালেম পোস্টে লিখে থাকেন: হিব্রু সংস্করণে; কমই তার ইংলিশ প্রতিবেদন ছাপা হয়। এই লেখাটি ১৯৮৫ সনের। তিনি লিখেছেন,

"তরুণীদের ধরে নিয়ে যায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর লোকজন। তারপর তাকে বিবস্ত্র করা হয়। ছবি তোলা হয় বিভিন্ন পোজের। তারপর তাকে গণধর্ষণ করা হয়। এ অবস্থায় তরুণীটি যখন ভগ্নহৃদয় এবং মর্মাহত, - তখন তার পিতা, ভাই অথবা এমন কোনো সম্পর্কের, যার সঙ্গে বিবাহ চলে না, - এমন কোনো ব্যক্তিকে ধরে এনে কৃত্রিম উপায়ে (ইনজেকশান বা মুখে খাওয়ার ঔষুধ) প্রচণ্ডভাবে যৌনাবেগ সৃষ্টি করে রাখা হয়। তারপর বাধ্য করা হয় তাকে ধর্ষণ করার জন্য।

অনিচ্ছা, অজ্ঞানতায় "ধর্ষণ" করার কাজটির তুলে রাখা হয় অজস্র ছবি। তারপর সেটা "সেট করা" নাটকের অংশ হিসেবে তাকে উদ্ধার করে নেয় ইহুদি রাব্বাইদের কেউ। নাটকের অংশ হিসেবে তৈরি হয়ে আছে এমন "মুসলমান সংগঠনের" কাছে করা হয় হস্তান্তর। সেই মুসলমানরূপী ইহুদিরা বুঝিয়ে দেয় - এ জীবন আর রেখে কী হবে, আল্লাহর জন্য শত্রু ঘায়েল করে শহীদ হয়ে যাও। উপদেশটি সৎ বলেই মনে হয়। গায়ে বোমার বেল্ট জড়িয়ে নেয় সেই তরুণীটি। তাকে টার্গেট দেওয়া হয় কোথায় যাবে, কে সাহায্য করবে, - এই সব।

টার্গেট জানানো হয় "সেনাবাহিনী", কারণ তাদের প্রতিই তরুণীটির বিদ্বেষ। কিন্তু, বাসে উঠার পর কিংবা বাজার এলাকায় গমন করার পর টিপে দেওয়া হয় রিমোট কন্ট্রোল। কেবল সাধারণ নিরপরাধ ইহুদি জনগণই মরে সুইসাইড বোমায়, কখনও সেনাবাহিনীর একটি সদস্যেরও কিছু হয় না। দু'ঘণ্টার মধ্যে "পোর্ট্রেইট কোয়ালিটির" ছবি চলে যায় টেলিভিশনে। পূর্বেই ছবি রাখা হয়েছিল, নাম, ঠিকানা সব নির্ভুল।

জগৎ শুনেছে, মুসলমান তরুণীর সুইসাইড বোমায় অনেকজন ইসরায়েলি নিরপরাধ জনগণ মারা হয়েছে। এ লেখাটি যখন রচিত হয় তখন (অক্টোবর ৩) ইসরায়েল সিরিয়া আক্রমণ করে সুইসাইড বোমা হামলার প্রতিবাদে। ১৯ জন ইসরায়েলি নাগরিক মারা গেছে। সেখানেও ছিল এমনি দুর্ভাগ্যের শিকার এক তরুণী।"

"সুইসাইড বোমা" ইসলামের আদর্শকে বিশ্বের সামনে অনেক নিচু করেছে। তার অর্থ এই নয় যে সব সুইসাইড বোমা বর্ণিত পদ্ধতিতে ঘটে। তবে এটা হচ্ছে এই পদ্ধতির সূত্রপাত। ইহুদিরা ষড়যন্ত্র করে এই পথে মুসলিমদেরকে উঠিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উচ্ছ্বাসে তা করে যাচ্ছে। এর পেছনেও যে অদৃশ্য যোগান, উৎসাহ-উদ্দীপনা, অর্থ, সুযোগ, উপকরণ - এসবের পেছনেও আছে পশ্চিমাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সমর্থন। ব্যবহৃত হয় নির্বোধ মুসলমান।

এই যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিস্তার যা মুসলিমদেরকে সারা বিশ্বে ঘৃণিত জীবনে পরিণত করেছে তা করা হচ্ছে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে।

এখন আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলোও যদি এই ষড়যন্ত্রকে উপলব্ধি না করে প্রভুদের ভাব বুঝে সেই মোতাবেক ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে তাহলে সেটা হবে ঘোর অন্ধত্ব। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে নাস্তিকও হই তবু আমাদের পাসপোর্টে একটি মুসলিম পরিচয় ব্যবহার করতে হচ্ছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ঘৃণার প্রসার ঘটালে এই ঘৃণার বাইরে আমিও থাকতে পারব না। এখন আমার জ্ঞান, প্রতিভা, শিক্ষা, মেধা কোন কাজে ব্যয়িত করব সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আমরা কি সত্যের পক্ষে কলম ধরব, নাকি মিথ্যার পক্ষে? সামান্য কিছু টাকার জন্য কাজ করব, না মানুষের শান্তির জন্য?

আমরা পশ্চিমাদের চশমা দিয়ে দেখব, না নিজেদের জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে সেই মোতাবেক দেখব সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখনই সময়। জাতির চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে মিডিয়ার ভূমিকা গ্রহণ অনিবার্য। দক্ষিণ এশিয়ার প্রবেশদ্বারা হিসাবে যেন বাংলাদেশকে কেউ ব্যবহার করতে না পারে, যেন এদেশের ১৬ কোটি ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কেউ বিপথে চালিয়ে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটাতে না পারে, কিংবা কেউ যেন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করতে না পারে, যেন পুরো জাতিটি একই ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়, যেন তারা সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে, যেন তাদের ধর্মীয় চেতনা জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে, যেন তারা ধর্মব্যবসায়ীদের সকল ষড়যন্ত্রকে, সকল প্রকার সন্ত্রাসকে বলিষ্ঠভাবে মোকাবেলা করার চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেজন্য গণমাধ্যমকর্মীরা সবার চেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারেন।

এখন সময়ের দাবি, গণমাধ্যমকর্মীদের এখন ভূমিকা পালন করতে হবে। নয়তো ষড়যন্ত্রের ফলে দেশটি যদি ইরাক সিরিয়ার মতো মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়, তখন কেউই ভালো থাকবে না। আজ ইরাকের কোনো একটি পরিবারও নেই যারা তাদের স্বজন হারায় নি। বিরাট অর্থবিত্তের মালিক বা যারা বড় বড় চাকরি করতো তারা এখন সব সম্মান হারিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষা করছে। আমাদের জাতির সেই পরিণতি আমরা চেষ্টা করলে এখনো ফেরাতে পারি তবে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। আর ঐক্যবদ্ধ হতে একটি ঐক্যসূত্র বা আদর্শ লাগে, সেটা আমাদের কাছে আছে। সচেতন মহলের প্রতি আমাদের দাবি, আপনারা সেটা জানুন। যদি সেই কথাগুলো প্রয়োজনীয় হয় বা জাতির জন্য প্রযোজ্য হয় তাহলে তা প্রয়োগ করে জাতিকে রক্ষায় নিজেদের অবস্থানে থেকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করুন। আমাদের বিশ্বাস যদি খোলা মন নিয়ে আমাদের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করেন, দেশ ও জাতিকে রক্ষার পথটি সহজেই খুঁজে পাবেন।

আমাদের এই দেশটি যে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়তে যাচ্ছে এটি আমাদের কথা নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সেই রকম আশঙ্কাই বার বার প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

➪ বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট জঙ্গিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে, এমন বিষয় স্বীকার করে নিতে আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ আছে। কিন্তু বিষয়টি স্বীকার করে নিলে বাংলাদেশের অবস্থা সিরিয়া কিংবা পাকিস্তানের মতো হবে এবং বাংলাদেশের ওপর হামলে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। এটা যাতে না হয়, সেজন্যে জাতি হিসেবে সবাইকে সচেতন হতে হবে। (বিবিসি বাংলা ০৮/১১/২০১৫)

➪ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেওয়া, আইনের হাতে সোপর্দ করা এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা লাগবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও শক্তিশালী করা হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো দেশের মানুষকে সচেতন করা। সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হলেই দেশকে আরও শান্তিপূর্ণ করা সম্ভব। (দৈনিক প্রথম আলো ১৭/১১/২০১৫)

➪ সাংবাদিকদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লেখনির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। (দৈনিক সমকাল, ০১/০৭/১৫)

সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমানও জঙ্গিবাদ মোকাবেলা সম্পর্কে এই একই যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজনীতিকে যেমন রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে, ইসলামের মধ্যে যারা জঙ্গিবাদ নিয়ে আসছে তাদেরকে কোর'আন-হাদিস দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। সেক্যুলারিজম দিয়ে মোকাবেলা করে আপনি পারবেন না। কারণ তারা সেক্যুলারিজমকে একটি চ্যালেঞ্জিং পার্টি মনে করে অর্থাৎ হয় তারা জিতবে আপনি হারবেন অথবা আপনি হারবেন তারা জিতবে। এভাবে এটাকে আপনি মোকাবেলা করতে পারবেন না।" (চ্যানেল আই-তৃতীয় মাত্রা, ১৯ অক্টোবর ২০১৫)।

মতিঝিলে আয়োজিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাবেশে লেখক (৬.১২.২০১৪)

নৈতিক অবক্ষয়ের নেপথ্যেঃ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা

আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ অসংখ্য নবী রসুল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের জাতির কাছে যে জিনিসটা নিয়ে এসেছেন তা হলো তওহীদ অর্থাৎ এক স্রষ্টার হুকুম, এক কথায় জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে সত্যের পক্ষে ও মিথ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। এই পথে যখন জাতি চলেছে তখন তারা ফলস্বরূপ শান্তিপূর্ণ ভারসাম্যযুক্ত সমাজ পেয়েছে।

নবী রসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতায় শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাঠালেন ঈসাকে (আ.)। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র মুসা (আ.) এর অনুসারী ইহুদি জাতির কাছে। তিনি এসেছিলেন মুসা (আ.) এর আনীত দীনকে সত্যায়ন করে শুধু মাত্র দীনের হারিয়ে যাওয়া আত্মিক ভাগটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে দীনের ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের জন্য। তিনি কখনই খ্রিষ্ট ধর্ম নামে নতুন কোনো ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি। ঈসা (আ.) যদি ইহুদিদের বাইরে তার দেখানো পথ অনুসরণ বা গ্রহণ করতে বলতেন তাহলে তা হতো অনধিকার চর্চা। কারণ স্রষ্টা তাঁর কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র ইহুদিদের ভেতরে। তিনি তাঁর সীমারেখার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, I was sent only to the lost sheep of Israel. (Matthew 15:24) অর্থাৎ আমি শুধু মাত্র বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষগুলোকে পথ দেখাতে এসেছি।

এভাবে ঈসা (আ.) যখন তাঁর প্রচার কাজ শুরু করলেন তখন পূর্ববর্তী দীনের বিকৃত রূপের যারা ধারক বাহক ছিলেন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ঈসা (আ.) তাদেরকে বড় বড় মো'জেজাগুলো দেখানোর পরও তারা কেউই তাঁকে স্বীকার করল না। শুধুমাত্র সমাজের নিচুশ্রেণির হাতে গোনা কিছু ইহুদি তাঁর প্রতি ঈমান আনলো। বিকৃত দীনের ধারক বাহক রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা তাদের তখনকার প্রভু রোমানদেরকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হলো যে, ভবিষ্যতে ঈসা (আ.) রোমানদের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হবে। ফলে এই পুরোহিতরা রোমানদের সাহায্য নিয়ে ঈসা (আ.) কে হত্যার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করল। তখন আল্লাহ তাকে সশরীরে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক জুদাসকে শাসকগোষ্ঠী ঈসা (আ.) মনে করে হত্যা করল। এই ঘটনার পর ঈসার (আ.) অনুসারীরা প্রাণভয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গেল।

কিছুদিন পর পল নামের একজন লোক ঈসা (আ.) এর উপর বিশ্বাস আনলো। তবে তার পরবর্তী কাজগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, ঈসা (আ.) এর অনুসারীদের মাঝে ঢুকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে বারবার যে কাজে সাবধান করে দিয়েছিলন অর্থাৎ অ-ইহুদিদের মাঝে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা যাবে না, কিন্তু পল তার অনুসারীদেরকে এই শিক্ষা ইহুদিদের বাইরে প্রচার করা শুরু করলো। তবে তিনি যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তা যে শুধু ঈসা (আ.) এর ধর্মের থেকে বহু দূরে তাই নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। ঈসা (আ.) এর প্রায় তিনশ বছর পর রোম সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মবিস্তারে মনোযোগ দেন। এই নতুন ধর্মটি ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে রাষ্ট্রধর্মরূপে গৃহীত হয়ে গেল।

স্মরণাতীতকাল থেকে রাষ্ট্র সর্বদাই চলেছে ধর্মীয় বিধি বিধান, আইন কানুন দ্বারা। স্বভাবতই খ্রিষ্টধর্মকে যখন সমস্ত ইউরোপ গ্রহণ করে নিল তখন তারাও চেষ্টা করল খ্রিষ্টধর্মকে দিয়ে তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে তো কোনো আইন কানুন, দণ্ডবিধি নেই অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান নেই। তাই খ্রিষ্টধর্ম সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। প্রতিপদে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অঙ্গনে সংঘাত আরম্ভ হলো। এই সংঘাতের বিস্তৃত বিবরণে না গিয়ে শুধু এটুকু বললেই চলবে যে, এই সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ইউরোপীয় নেতা, রাজাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা রইল। হয় এই ধর্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে, নইলে তাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে। তৃতীয় আর কোনো রাস্তা রইল না। যেহেতু সমস্ত ইউরোপের মানুষকে নাস্তিক বানানো সম্ভব নয়, কাজেই তারা দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিল। রাজা অষ্টম হেনরির সময় ইংল্যান্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হয়। এরপর থেকে খ্রিষ্টান জগতের রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন দণ্ডবিধি ইত্যাদি এক কথায় জাতীয় জীবনে স্রষ্টার আর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষতার।

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও মানবজাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই প্রথম মানুষ তাদের জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসন দেওয়ার ফলে হয়তো এ আশা করা যেত যে জাতীয় জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড না থাকায় সেখানে যত অন্যায়ই হোক ধর্মের প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে মানুষ ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণ থাকবে। কিন্তু তাও হয় নি। কারণ মানুষের শিক্ষাব্যবস্থার ভার রইল ঐ ধর্মনিরপেক্ষ কার্যত ধর্মহীন, ন্যায়-অন্যায় বোধহীন জাতীয় ভাগটার হাতে। সুতরাং অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন থেকেও ধর্মের প্রভাব আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করল। স্রষ্টার দেয়া

জীবন-বিধানে যে দেহ ও আত্মার ভারসাম্য ছিল তার অভাবে ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় যে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল তাদের শুধু একটি দিকেরই পরিচয় লাভ হলো-দেহের দিক, জড়, স্থূল দিক, স্বার্থের দিক, ভোগের দিক। জীবনের অন্য দিকটার সাথে তাদের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সৃষ্টি করে তা জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করার ফলে শুধু জাতীয় জীবনই অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি ও রক্তপাতে পূর্ণ হয়ে যায় নি, যেখানে ধর্মকে টিকে থাকার অধিকার দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে, সেখানেও অধিকাংশ মানুষের জীবন থেকে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, নিতে বাধ্য হয়েছে। দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার পরিণাম এই হয়েছে যে, মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে।

আমরা সমাজে প্রচলিত অন্যায় অপরাধের জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী করে থাকি কিন্তু একটু গভীরে গেলেই আমরা দেখব যে, এই সকল অশান্তির জন্য এই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেমই দায়ী। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কাদামাটির ন্যায়। এই কাদামাটিকে যে ছাঁচ বা ডাইসের মধ্যেই ফেলা হবে, কাদামাটি সেই ডাইসের আকার ধারণ করবে। কখনও কোনো মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে চোর হয়ে, ডাকাত হয়ে, অন্যায়কারী, দুর্নীতিবাজ হয়ে জন্ম নেয় না। কিন্তু অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে এমন অপরাধী চরিত্রের হয়ে যায়। অন্যান্য জাতির মতো আমরাও এমনই এক স্রষ্টা-বিবর্জিত আত্মাহীন সিস্টেম গ্রহণ করেছি, যার আবশ্যম্ভাবী ফল আমরা এড়াতে পারছি না। মানুষ হয়ে যাচ্ছে আত্মাহীন পশু। এই সিস্টেমে খুব সহজেই মানুষের সদগুণাবলীকে অসদগুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। শত চেষ্টা করেও মানুষ ভালো হয়ে থাকতে পারছে না।

ধর্মহীন জীবনব্যবস্থার প্রভাবে ব্যক্তিজীবন থেকেও ধর্ম লুপ্ত হয়ে মানবসমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্র বিরাজমান স্রষ্টার ভয়ে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ অপরাধ করে না, কিন্তু স্রষ্টাহীন জীবনব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেই অপরাধ সংঘটন করে। একারণেই সর্বপ্রকার অপরাধ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে প্রযুক্তির উন্নয়ন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতন পৃথিবীতে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজাতির জন্য স্রষ্টার নেয়ামত, কিন্তু আজ এগুলো যতটা না মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বহুগুণ ব্যবহৃত হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে। সংবাদপত্রগুলো দুঃসংবাদে ভরা, রাজনীতি আর মিথ্যা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিকৃষ্ট মানুষ সম্মানিত হচ্ছে। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে নির্বাসন দেওয়ার পরিণামেই এই ভয়ঙ্কর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম হয়েছে। তাই একে আল্লাহর রসুল দাজ্জাল অর্থাৎ একটি পরাশক্তিধর একচক্ষুবিশিষ্ট দানবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য ধর্মকে বিসর্জন করার প্রয়োজন নেই, ধর্মকে বাদ দিলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যবহার হয় মানুষের ক্ষতিসাধনে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলামের সোনালি যুগে অর্থাৎ ১২৫৮ সনে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়

মুসলিমরাই ছিল শিক্ষকের আসনে। ঐ সময়ে ইউরোপে চলছিল মধ্যযুগীয় বর্বর যুগ, অন্ধকার যুগ (Dark age- 6th to 13th centuries)। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া আধিপত্য যার ভিত্তি রচনা করে গেছেন মুসলিম বিজ্ঞানীরাই। এটা ইতিহাস যদিও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে সেগুলো চাপা দেওয়া হয়েছে।

মূলত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ব্যতীত একটি কল্যাণকর মানবসমাজ কল্পনা করা যায় না। আর নৈতিক শিক্ষার মূল বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত। মানবসমাজে বিরাজিত সকল নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিকে স্রষ্টার আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, পৃথিবীতে ও পরলোকে কু-কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে উৎসাহ দেয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসের কারণেই ব্যক্তি সবচেয়ে গোপন ও নিরাপদ জায়গাতেও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত হতে পারে না। কিন্তু এ বিশ্বাসের বীজ যার হৃদয়ে বপিত হয় নি তার কাছে নৈতিকতা অর্থহীন মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত এবং এগুলোর আদি উৎসও ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে যে নৈতিক শিক্ষার কথা বলা হয় তাতে ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে তার দায়বদ্ধতার কারণে নীতি মেনে চলে। ফলে ব্যক্তি যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ে কিংবা মানবিক দুর্বলতার কারণে তার নৈতিক গণ্ডির বাইরে চলে যেতে পারে। সে তো পরকালীন শাস্তির ভয়ে নীতি মানছে না, তাই একবার ভাঙলে আবার তা গড়ে তোলার শক্তিশালী অনুপ্রেরণা পায় না। সে ভাবে যে, নশ্বর এই পৃথিবীতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন কেটে গেলেই হলো।

সুতরাং ধর্মকে কাজে লাগিয়েই সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা সম্ভব, অন্যভাবে নয়। শিশুকাল থেকেই এ চরিত্রগঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয় কেননা ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপযুক্ত সময় তার শৈশব ও কৈশোর। এ সময় শিশুকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তার গন্তব্যও সেদিকেই হবে। আমরা সবাই চাই, আমাদের শিশুরা জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতা-দক্ষতায় অনন্য হোক এবং তাদের সেই জ্ঞান ও দক্ষতা কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হোক। অথচ তাদেরকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সকল নৈতিকতার উৎস ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখছি। বেঁচে থাকার জন্য যেমন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সেই মানুষগুলোকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা। বিকৃত ধর্ম সমাজকে আরো দূষিত করবে। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা যেমন পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে দিতে হবে তেমনি দিতে হবে রাষ্ট্রের উদ্যোগেরও মাধ্যমে। সেই শিক্ষা আমাদের কাছে আছে এবং আমরা তা প্রচার করে যাচ্ছি।

গণতন্ত্রের নামে যা চলছে

পশ্চিমাদের কাছ থেকে কথা শিখে (leap reading) আমরাও একটি কথা বলতে দারুণ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, **গণতন্ত্রের সঠিক চর্চাই সকল সমস্যার সমাধান।** এই কথাকে আশ্রয় করে গণতান্ত্রিক দলগুলো একে অপরকে গণতন্ত্রের অধিকতর চর্চা করার উপদেশ প্রদান করে থাকে। কেতাবে যাই লেখা থাক বাস্তবে গণতন্ত্রের যে করাল রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা বড়ই আতঙ্কজনক। দুনিয়াময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে দেশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা হয়। এদেশেও তা হয়। গণতন্ত্রের নামে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়, অধিকার আদায়ের জন্য কথায় কথায় হরতাল ডাকা হয়, সাধারণ মানুষকে নাস্তানাবুদ করা হয়, যাবতীয় সহিংস কর্মাকাণ্ড চালানো হয়, কার্যালয় ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ, কারখানায় লক আউট করা হয়। এভাবে গণতন্ত্রের নামে বহু অপকর্ম জায়েজ করা হয়। রাজনীতিক নেতারা গণতন্ত্রের নামে সব রকম অপকর্ম করে সেটার দায় চাপিয়ে দেয় জনগণের উপর যে জনগণ মেনে নেবে না, জনগণ প্রতিরোধ করেছে ইত্যাদি। যে গণতন্ত্র প্রতারণার হাতিয়ার সেই গণতন্ত্রকে আমাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। ওষুধ বলে বিষ খাওয়ানো আর চলবে না।

কোনো সভ্য মানুষ এই জাতীয় গণতন্ত্র মানতে পারে না এবং এ রকম ব্যবস্থা দিয়ে কোনো দেশ সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নতি করতে পারে না। যে গণতন্ত্রের কারণে গত ৪৪ বছরে জাতিটি একদিনের জন্যও স্বস্তি পায় নি, যার দ্বারা প্রতিটি বিষয়ে জাতি বিভাজিত হয়ে যায়, সর্বদা দাঙ্গা-বিবাদ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, জাতীয় স্বার্থেও জাতি এক হতে পারে না, অবান্তর বিষয় নিয়ে হানাহানি হয়, একটা জাতি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, নিজের দলের লোকেরা পদের জন্য নিজেদের হত্যা করে, এ জাতীয় গণতন্ত্র দিয়ে পুরো দেশ, জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। এটাই সেই ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি যার দাসত্ব আমরা স্বেচ্ছায় করে চলছি।

ফ্রান্সের খ্যাতনামা সাংবাদিক, লেখক ও চিত্রশিল্পী বেন নর্টন আধুনিক গণতন্ত্রের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে salon.com-এ প্রকাশিত তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "ব্রিটিশরা উনিশ শতকে ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ও মিশর দখল করার পর সেখানে মিথ্যাবাদী সরকার বসিয়েছিল। পাশবিক পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল, মিথ্যুক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর ভুয়া নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। এটাই ছিল ব্রিটিশদের এই জাতিকে বিনাশের প্রথম পদক্ষেপ।"

আশা করি এ সহিংসতা জাতিবিনাশী গণতন্ত্রের কথা আমাদের সংবিধানে লেখা নেই। সেখানে যে গণতন্ত্রের কথা লেখা আছে তা হলো, ভিন্ন মতের প্রতি

সহনশীলতা, অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সকলের বাক স্বাধীনতা, গবেষণার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা, কাউকে আঘাত না করে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন দিয়ে সরকার গঠনের স্বাধীনতা, সরকারকে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের মতামত প্রদানের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই যদি গণতন্ত্র হয়ে থাকে তবে আমরা এই সব নীতিকে অবশ্যই সমর্থন করি, এগুলোর বাস্তবায়ন চাই। কিন্তু গরু তো শুধু কেতাবে থাকলে হবে না, গোয়ালেও থাকা চাই।

মিডিয়ার উচিত হুজুগ সৃষ্টি না করে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা

মিডিয়া এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনগণকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে পারে। তারা কোনদিকে নিয়ে যাবে সেটা তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়। বিশ্ব এখন কোন সংকটে পতিত হয়েছে, দেশের কোন সংকট মুখ্য সেটা আমাদেরকে সঠিকভাবে প্রচার করতে হবে। আজকে দেখা যায় সাধারণ একটি পৌরসভা নির্বাচনকে নিয়ে দিনের পর দিন তুমুল প্রচার, টকশো, সংবাদ, লাইভ টেলিকাস্ট, প্রতি মুহূর্তের আপডেট ইত্যাদি হুলুস্থুল করে ফেলা হচ্ছে, ফলে মানুষের চিন্তা, দৃষ্টি ঐ সামান্য বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যায়।

এখন মিডিয়া কি জাতিকে ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত করবে নাকি জাতীয় সমস্যার সমাধানে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রণোদিত করবে, জাতিকে রক্ষার জন্য সম্মিলিত ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি করবে, মানবতার কল্যাণে কাজ করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে, মানুষের দেশপ্রেমের চেতনাকে কাজে লাগাবে না হুজুগে অপচয় করবে এ সিদ্ধান্ত মিডিয়াকে নিতে হবে।

গত ১ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ প্রতিদিনে প্রকাশিত "আঙ্গুল এখন আমাদের দিকে" শীর্ষক একটি লেখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও একাত্তর টেলিভিশনের অ্যাফেয়ার্স এডিটর সামিয়া রহমান খুব সরলভাবেই এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন, "আমাদের গণমাধ্যমকর্মীদের, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অবশ্য এটি খুব প্রচলিত অভিযোগ আমরা সবকিছু বদলে দিই। আমরা নাটকীয়তা তৈরি করি, ঘটনা তৈরি করি। সেনসেশন, উত্তেজনা তৈরি করি। আমরা সব সময় সবার দিকে আঙ্গুল তুলি। অভিযোগ করি। এখন অভিযোগের তীর স্বয়ং আমাদের দিকে, গণমাধ্যমের দিকে। গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমের এজেন্ডা নির্ধারণ এবং এজেন্ডার পক্ষে সম্মতি অর্জনের জন্য প্রচার নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। বলা হচ্ছে গণমাধ্যম পক্ষপাতিত্ব করে, গণমাধ্যম নিরপেক্ষ নয়। নানা অভিযোগে আমরা জর্জরিত। এখন সঙ্গে নতুন অভিযোগ যুক্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে আমরা বিভ্রান্তি তৈরি করছি বা উসকে দিচ্ছি।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে গণমাধ্যম তার ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়েছে। শুধু তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা দিয়েই নয় বরং এ তিনটি কাজের মাধ্যমে বলীয়ান হয়ে গণমাধ্যম এখন মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। ...গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে যে, ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ এবং তা প্রচার ও প্রসারের জন্য তারা এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সমাজে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা যত বেড়েছে, গণমাধ্যম তত মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে এবং তার একচ্ছত্র আধিপত্য তত বেড়েছে। কতটুকু সফল হচ্ছে তা আলোচনাসাপেক্ষ। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সত্যি কি আমরা গণমাধ্যমকর্মীরা এখন মানুষের চিন্তার দিক পরিসর ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার নামে ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় ঘটাতে যাচ্ছি?"

আজকের গণমাধ্যম সম্পর্কে বলতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন এর একটি উক্তিই যথেষ্ট। তিনি 'যুদ্ধবাজ সাংবাদিকতা বনাম মুক্ত-মিডিয়া মিথ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "মূলধারার গণমাধ্যম মূলত কর্পোরেট গণমাধ্যম, বিশাল সংস্থাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের এজেন্ডা প্রসারের কাজেই গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয়। কর্পোরেট এলিটকুল গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের জন্য, মানুষকে তথ্য দান বা সচেতন করে তোলার জন্য নয়।" যারা মিডিয়াতে কাজ করতে আসছেন তাদের অধিকাংশই আসছেন সাংবাদিকতা পেশার সুবিধা হাসিল করে অর্থ ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য। তাদের স্বার্থপরায়ণতা ও পক্ষপাতিত্বসুলভ মনোবৃত্তির দরুন তাদের পরিবেশিত সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও হারিয়ে যাচ্ছে। বিবিসি কিংবা রয়টার্সের মতো সংবাদসংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাও বার বার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তাদের প্রতিবেদকগণ বহুবার তাদের নির্ধারিত সীমানা পেরিয়েছেন, কখনও ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন, কখনও সেটা রাজনীতিক শুদ্ধতাকে লঙ্ঘন করেছে। কিছুদিন আগে বিবিসির মহাপরিচালক ও প্রধান সম্পাদক জর্জ এনটুইসেল এক রাজনীতিকের নামে মিথ্যাচার করার দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১২)। সাম্প্রতিক একটি জরিপে জানা যায় ব্রিটেনের ৭০% জনগণই পত্র-পত্রিকার সংবাদ বিশ্বাস করেন না (The Guardian- 24.01.2012)।

বিশ্বাস না করার কারণ গণমাধ্যমগুলো বার বার মানুষকে ভুল পথে নিয়ে গেছে, মিসগাইড করেছে যা পরে জনগণ বুঝতে পেরেছে যে সেটা মিথ্যা ছিল। ঐ যে প্রথমেই বলেছিলাম ইরাকের বিরুদ্ধে প্রচারিত গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার মিথ্যা অভিযোগের কথা যা চূড়ান্ত বিধ্বংসের পর মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। মিডিয়া যখন স্বার্থভিত্তিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তখনই তার অধঃপতন হয়েছে। এই কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমারা যেদিকে মানুষকে নিয়ে যেতে চায় সেদিকে অন্ধের মতো না গিয়ে স্বাধীন দেশের স্বাধীন গণমাধ্যম হিসাবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটানো এখন সময়ের দাবি। আমাদের

এখন সময় হয়েছে নিজেদের পায়ের উপর মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর।

ইহুদি চক্রান্ত মোতাবেক প্রেস ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

The Protocols of the Elders of Zion বইটি গুপ্ত চক্রান্তের মাধ্যমে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের ইহুদি পরিকল্পিত একটি নীল নকশা। বইটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে তারা কী কূটকৌশলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং বিশ্বব্যবস্থাকে কতটা নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। এ বইতে তারা সংবাদমাধ্যমকে তাদের ক্ষমতা বিস্তার ও শাসনকার্যের হাতিয়ার হিসাবে কীভাবে ব্যবহার করবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। এখানে তার কয়েকটি ধারা তুলে ধরা হলো। উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো যেন আর তাদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে তাদের এজেন্ডা পূরণে ব্যবহৃত না হয়, তাদের ক্রীড়নক হয়ে না থাকে। তারা লিখেছে:

স্বাধীনতা (freedom) শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আমরা এ শব্দটির যে অর্থ গ্রহণ করি তা হলো - 'যা যা করার অনুমতি দেয়া হয় তা তা করার অধিকার।' আমরা প্রেসের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা বলতে এ অর্থই ব্যবহার করব।

১. প্রেসের বর্তমান ভূমিকা কি? মানুষের ভাবাবেগকে উত্তেজিত করা বা ক্ষেপিয়ে তোলার কাজই প্রেস করে যাচ্ছে। আমাদের অথবা অন্য কোন স্বার্থপর দলের স্বার্থেই প্রেস এ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রেস সাধারণত প্রাণহীন, ন্যায়নীতি-বিরোধী ও মিথ্যা প্রচারের কাজে নিয়োজিত। প্রেস কার স্বার্থে কাজ করছে জনগণ তা বুঝতেই পারে না।

২. আমরা প্রেস ও ছাপাখানাকে কঠোর আইনের বাঁধনে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলব। কেননা, ছাপাখানা থেকে যদি স্বাধীনভাবে পুস্তক-পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনাদি ছাপা হয় তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলতে থাকবে। প্রচার কার্যের উপকরণাদি বর্তমান যুগে খুবই ব্যয়বহুল। কিন্তু আমরা এটিকে রাষ্ট্রের জন্য খুবই লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করব। আমরা প্রেসের উপর বিশেষ কর আরোপ করব, সংবাদপত্র বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য জামানত স্বরূপ নগদ টাকা আদায় করব এবং তাদের কাছ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকা অবলম্বন না করার নিশ্চয়তা গ্রহণ করব। এরপরও যদি আমাদের উপর কোন আক্রমণ করা হয় (যদিও তা অসম্ভব) তবে আমরা নির্মমভাবে তাদের উপর জরিমানা আরোপ করব। বিশেষ কর, জামানতের টাকা, জরিমানা ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হতে থাকবে।

৩. দলীয় মুখপত্রগুলো আমাদের উপর প্রথম দফা হামলা করলে আমরা তাদের মাফ করব কিন্তু দ্বিতীয় দফায় পত্রিকা বন্ধ করে দেব। কারো শক্তি নেই যে, আমাদের সরকারের কার্যক্রমকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে পারে। পত্রিকা বন্ধ করার জন্য আমরা যে যুক্তি পেশ করব তা হচ্ছে এই যে, অসময়োচিত ও অন্যায়ভাবে উক্ত

পত্রিকা গণমনে আমাদের বিরুদ্ধে অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। আমি অনুরোধ করছি, ভালো করে শুনে রাখবে, আমাদের সমালোচনাকারীদের মধ্যে ঐসব পত্রিকাও সামিল থাকবে যেগুলো আমাদের স্বার্থে পরিচালিত। কিন্তু এরা ঐসব বিষয়েই সমালোচনা করবে যেগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বাহ্নেই নীতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

৪. আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া একটি খবরও জনসাধারণের কাছ পৌঁছতে পারবে না। এমনকি এখনই আমরা একাজে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছি। মাত্র অল্প কয়েকটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানই দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে খবর সংগ্রহ বিভিন্ন স্থানে তা পরিবেশন করে। এগুলোকে আমরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করব যে, এগুলো একমাত্র আমাদের নির্দেশিত তথ্যই পরিবেশন করবে।

৫. আমরা জনগণের মন-মগজকে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সস্তা দামের পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশ করব এবং সস্তার দরুন সকলেই তা পড়বে। করভারের দ্বারা সাহিত্য রচনার প্রবণতাকে স্তিমিত করে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখব, সাহিত্যিকদের তৎপরতা আমাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে অগ্রসর হয় তাহলে সে দেখতে পাবে যে, তার লেখা ছাপিয়ে প্রকাশ করতে কেউ প্রস্তুত নয়। কোন লিখিত বিষয় ছাপিয়ে প্রকাশ করার জন্য মুদ্রাকরকে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এর অনুমতি নিতে হবে। এভাবে আমরা পূর্বাহ্নেই আমাদের বিপক্ষে কি কি প্রকাশ হতে যাচ্ছে জানতে পারব এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ জনসমক্ষে প্রকাশ হতে যাচ্ছে সেগুলোর জবাব এবং কৈফিয়ত তৈরি করে নিতে পারব।

৬. আমরা যদি দশটি সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেই তাহলে নিজেরাই ত্রিশটি সংবাদপত্র জারি করব এবং নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা এ অনুপাতই রক্ষা করে চলব। কিন্তু জনসাধারণকে এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করার সুযোগ দেয়া হবে না।

৭. সংবাদপত্রের প্রথম সারিতে থাকবে সরকারি ধরনের পত্রিকাগুলো। এগুলো যেহেতু সর্বদা আমাদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে সেহেতু জনমনে এদের প্রভাব থাকবে খুবই কম। দ্বিতীয় সারিতে আধা সরকারি পত্রিকাগুলো থাকবে। এগুলো নির্জীব ও লক্ষ্যহীনদের নিকটে টেনে আনার দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয় সারিতে আমাদের নিজেদের বিরোধিতার জন্য আমাদেরই জারিকৃত পত্রিকাগুলো থাকবে। এসব পত্রিকা বাহ্যত এমন হাবভাব দেখাবে যে মনে হবে এরা আমাদের ঘোর বিরোধী। আমাদের প্রকৃত বিরোধী মহল এ সংবাদপত্রগুলোর ছদ্মাবরণ দেখে অকপটে এদের প্রতি আস্থা স্থাপন করবে এবং তাদের প্রকৃতরূপ আমাদের কাছে খুলে ধরবে। সংবাদপত্রের তৃতীয় সারি থেকে আমরা নিজেদের লক্ষ্য করে গুলি করব এবং প্রয়োজনবোধে আমাদের আধা সরকারি প্রেসগুলো থেকে সাফল্যজনক

ভাবে এগুলোর মোকাবিলা করব।

মানুষকে ধর্মহীন করার প্রচেষ্টা সফল হয় নি কেন?

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞা করার বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার সুযোগ নেই যদিও তা করা হচ্ছে। যদি একে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে তাদের ধর্মবিশ্বাস বা ঈমানকে ধর্মব্যবসায়ী একটি শ্রেণি ভুল খাতে প্রবাহিত করে জাতির অকল্যাণ করবে। ধর্মবিশ্বাস অস্বীকার করার সুযোগ নেই। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় ধর্মহীন বস্তুবাদী সভ্যতা শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, প্রচার মাধ্যমে বহু অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সেটা করতে সক্ষম হয় নি। কারণ:

১. মানুষের ভেতরে স্রষ্টার রূহ অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ রয়েছে। সে অবচেতন মনেই আপন স্রষ্টাকে অনুভব করে, যে কোনো কষ্টে, সংকটে তাঁর কাছে আশ্রয় চায়।

২. আল্লাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো সম্মানের সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশ্লেষণ করছে। এগুলোর স্বর্গীয় বাণী মানুষের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে মাথায় করে রাখছে, সন্তানকে যেমন যত্ন করা হয় সেভাবে যত্ন করছে। সুতরাং মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা অপ্রাকৃতিক, বাস্তবতা-বিবর্জিত, নিতান্তই অর্বাচীন ও মূঢ়তাসুলভ পরিকল্পনা।

৩. অতীতে হাজার হাজার হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্ম। এই ইতিহাস মানুষের জানা আছে। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদির শাসনামল এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও শান্তিময় নয়। এ মতবাদগুলো তাত্ত্বিকভাবে সুন্দর কিন্তু কখনো বাস্তবে তার প্রতিফলন কখনো দেখা যায় নি। পক্ষান্তরে ধর্মের শাসনে প্রাপ্ত সেই অনুপম শান্তির স্মৃতি মানবজাতির মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই যুগের হাওয়া তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, তারা শান্তির আশায় বারবার ধর্মের দিকেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শেষ যুগে (কলিযুগ, আখেরি যামানা, The Last hour), আবার ধর্মের শাসন বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ বৈরিতা থাকবে না, কোনো অবিচার, অন্যায় শোষণ থাকবে না, পৃথিবীটা জান্নাতের মত শান্তিময় (Kingdom of Heaven) হবে। এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ মানুষ সত্য ধর্মের উত্থানই কামনা করে। এটা তাদের ঈমানের অঙ্গীভূত, এ বিশ্বাস মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

৪. মানুষকে ধর্মহীন করতে না পারার একটি বড় কারণ মানুষের বিকল্প জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করার ব্যর্থতা। স্রষ্টার প্রেরিত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থার পরিবর্তে

এমন কোনো ব্যবস্থা মানবজাতি আজ পর্যন্ত তৈরি করতে পারে নি যেটা একাধারে মানুষের আত্মিক, মানসিক, শারীরিক অর্থাৎ এক কথায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করবে, বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে; কিন্তু মানুষ কড়াই থেকে চুলায় লাফ দিয়েছে, চুলা থেকে কড়াইতে উঠেছে। এর পরিণামে একটা সময়ে আবারও মানুষের সামনে সেই ধর্মই সমাধান হিসাবে প্রতিভাসিত হয়েছে।

৫. এ অঞ্চলের (প্রাচ্য) মানুষের অন্তর বিশ্বাসভিত্তিক, ধর্মবিরোধী নয়। হাজার হাজার বছর থেকে ধর্ম এদের অস্থিমজ্জার সাথে মিশে আছে। মুসলমানদের আগমনের পূর্বেও সনাতন ধর্মের শিক্ষার প্রভাবে মানুষের চরিত্র এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে, মানুষ জীবন গেলেও মিথ্যা বলত না, ওয়াদা খেলাফ করত না, আমানতের খেয়ানত করত না, দুধে পানি মেশাত না, ওজনে কম দিত না, অন্যের ক্ষতি হয় জীবন গেলেও এমন কাজ করত না, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় ও পূর্ণ নিরাপত্তা দিত। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এত সুখ সমৃদ্ধি ছিল যে দান নেওয়ার মতো লোক পাওয়া যেত না। এগুলো আজকে বলতে গেলে অনেকে হয়তো গল্প মনে করবেন কিন্তু এটা ইতিহাস। মুসলিম সুলতানদের শাসনামলে এদেশের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্ণযুগের কথা কে না জানে? টাকায় আট মন চাল আর গোলা ভরা ধান - গোয়াল ভরা গরুর কথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। সেই অবস্থা থেকে আজকের অবস্থা কীভাবে আসলো? তরুণ প্রজন্ম সেই ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন, পশ্চিমাদের সমৃদ্ধি দেখে তারা বোয়াল মাছের মতো হা করে চেয়ে থাকে। তারা জানে না যে আজকের পশ্চিমাদের সমৃদ্ধি আমাদেরই সম্পদ লুণ্ঠনের ফল। যাহোক সে বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে এটুকুই বলব, তারা আমাদেরকে পদানত করার পর তাদের দেশে প্রচলিত একটি বস্তুবাদী (Materialistic), আত্মাহীন (Soulless), ধর্মহীন (Seculer), ভোগবাদী (Epicurism), ভারসাম্যহীন (Imbalanced) একটি জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দিল। যার প্রভাবে মানুষগুলো হয়ে গেল স্বার্থপূজারী, দুশ্চরিত্র, আত্মকেন্দ্রিক, দাস মনোবৃত্তিসম্পন্ন, ভোগবাদী, ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন অনেক ক্ষেত্রে বিদ্বেষভাবাপন্ন। আর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আনুগত্যহীনতা, হানাহানি আর দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা, হীনম্মন্যতার প্রসার ঘটল। তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ জাতিটিকে অনুগত দাসজাতিতে পরিণত করল এবং এ জাতির ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিল। তাদেরকে ধর্মবিদ্বেষী নৈতিক শিক্ষাহীন, দেশপ্রেমহীন, প্রভুভক্ত একটি জাতিতে পরিণত করল। ১৮৩৫ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রেরিত লর্ড ম্যাকলের ঐতিহাসিক চিঠির কয়েকটি লাইন এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছিলেন: **"আমি ভারতের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু একটি ভিক্ষুকও আমার চোখে পড়ে নি, একটি চোরও আমি দেখতে পাই নি। এ দেশে সম্পদের এত প্রাচুর্য এবং এদেশের মানুষগুলি এতটাই যোগ্যতাসম্পন্ন ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী যে এদেশকে আমরা কখনোই**

পদানত করতে পারব না যদি না তাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ডটি ভেঙ্গে ফেলতে পারি। এ কারণে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা এখানকার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতিকে এমন একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাতে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ভাবতে শেখে যে, যা কিছু বিদেশি এবং ইংরেজদের তৈরি তা-ই ভালো এবং নিজেদের দেশের থেকে উৎকৃষ্টতর। এভাবে নিজেদের উপরে শ্রদ্ধা হারাবে, তাদের দেশজ সংস্কৃতি হারাবে এবং এমন একটি দাসজাতিতে পরিণত হবে ঠিক যেমনটি আমরা চাই।"

তাদের দেওয়া ঐ শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের হাতেই গণমাধ্যম, প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে ১৯৪৭ সনে ব্রিটিশরা আপাত স্বাধীনতা দিয়ে বিদায় নিল কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আরো মজবুত করল। সব দাসত্বের বড় দাসত্ব হচ্ছে মানসিক দাসত্ব। পাশ্চাত্যের প্রতি আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সেই দাসত্ব আজ আরো দৃঢ় হয়েছে। এখন তারা আমাদেরকে যা ভাবায় আমরা তাই ভাবি, যা দেখায় তাই দেখি। তারা যদি তেলাপোকাকে পাখি বলে কিংবা সুদকেই অর্থনৈতিক সুবিচারের উপায় বলে আমরা সেটাই মেনে নেই এবং নিজেদের জাতিকে সেটাই চাপিয়ে দেই।

এতগুলো বিষয়ের অবতারণার কারণ হলো, এখন কী করণীয়। ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে অস্বীকার করারও উপায় নেই, খাটো করারও উপায় নেই। তাহলে করণীয় একটাই, তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে। এটা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি যারা ধর্মকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। তাদের দ্বারা মানুষের ধর্মবিশ্বাস বার বার ভুল খাতে প্রবাহিত হয়ে অপরাজনীতি, সহিংসতা আর জঙ্গিবাদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। মিডিয়ার এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। মিডিয়া ধর্মের প্রকৃত সত্যগুলো তুলে ধরে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে পারে যেন ধর্ম আর কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে আটকে না থাকে। সময়ের প্রয়োজনে এতটুকু সাহসী ভূমিকা মিডিয়াকে নিতে হবে। ধর্মকে রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে। এ কাজেও মিডিয়ার অংশগ্রহণ জরুরি।

যারা সত্যের পক্ষ নেবে তারা সংখ্যায় কম হলেও তাদের পক্ষ নিতে হবে। পক্ষান্তরে অন্যায়কারী যতই অর্থ আর প্রভাবশালী হোক তার পক্ষ ত্যাগ করতে হবে। ধর্মবিশ্বাসকে অকল্যাণের পরিবর্তে কল্যাণের কাজে লাগানোর উপায় আমরা তুলে ধরছি। হেযবুত তওহীদ ধর্মের পক্ষ নিয়েছে বলেই সবাইকে এক পাল্লায় মাপা উচিত হবে না। আমরা কী বলি, কী চাই, কীভাবে চাই তা সঠিক ভাবে জানুন। জানার জন্য যত নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে চান করুন, অনুমান করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

আমরা যে বিষয়গুলো জাতির সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি তা সংক্ষেপে তুলে

ধরছি।

টাইম বোমা, নূহের (আ.) নৌকা ও মায়ের জীবন রক্ষা

এমন সংকটমুহূর্ত মানুষের জীবনে প্রায়ই উপস্থিত হয় যখন একজন সন্তানসম্ভবা নারী প্রসব বেদনায় আর্তনাদ করতে থাকেন এবং তাকে জরুরিভাবে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে ব্যস্তসমস্ত ডাক্তার বেরিয়ে এসে রোগীর পরিবারকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'আপনারা তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনারা রোগীকে বাঁচাবেন না বাচ্চাকে বাঁচাবেন? তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন।' তখন সবাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'মাকে বাঁচান।'

পৃথিবীর এখন সেই অবস্থা। আক্ষরিকভাবেই পৃথিবী মানবজাতির মা। এই সন্তানেরা তার মায়ের উপর এমন অন্যায় আচরণ, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়েছে যে আজ মা মৃত্যুশয্যায়। তারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভারসাম্যকে বহু আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা পানি ও বায়ুমণ্ডল দূষিত করেছে। অসংখ্য প্রজাতির প্রাণি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওজনস্তর ক্ষয় করে ফেলেছে, উষ্ণতা বাড়িয়ে বরফ গলিয়ে দিচ্ছে। পারমাণবিক বোমা ফেলে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাটি পর্যন্ত বিষাক্ত করে দিয়েছে। তাদের খাদ্যে বিষ, কথায় বিষ, তাদের সভ্যতা বিষাক্ত সভ্যতা। অন্যায় অবিচার জুলুম রক্তপাত অশান্তির এক চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়েছে এই পৃথিবী।

জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানবজাতিকে ধ্বংসের কিনারায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে আধুনিককালের ১৮ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা এক বিলিয়ন হতে সময় নিয়েছে কয়েক হাজার বছর। তারপর চমকে যাবার মতো ব্যাপার হলো, এটা দ্বিগুণ হয়ে দুই বিলিয়নে পৌঁছাতে সময় নেয় মাত্র একশ' বছর। সেটা ১৯২০'র দশকের কথা। এরপর মাত্র পঞ্চাশ বছরে সেই সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে চার বিলিয়ন হয়ে যায় ১৯৭০'র দশকে। খুব জলদিই এই সংখ্যাটা আট বিলিয়ন হয়ে যাবে। আর এই শতকের মাঝামাঝি জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৯ বিলিয়নে। শুধু আজকের দিনটার কথা ধরলেও এই পৃথিবীতে আরো আড়াই লাখ নতুন মানবসন্তান যোগ হয়েছে। আর এটা ঘটছে প্রতিদিন- রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, কোনো থামাথামি নেই। বর্তমানে আমরা প্রতি বছর পৃথিবীতে ৯ কোটি ১৩ লক্ষের উপর লোকসংখ্যা যোগ করছি।

পৃথিবীর সম্পদ সীমিত এবং পুঁজিবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে সেই সীমিত সম্পদের শতকরা ৯৫ ভাগই চলে গেছে মাত্র ৫% মানুষের অধিকারে, বাকিরা কোনোমতে প্রাণরক্ষা করে চলেছে। জনসংখ্যার আধিক্য, অসম বণ্টন আর সম্পদের স্বল্পতা মানুষের আত্মাকেও বিনষ্ট করে দেয়। যারা কোনো দিন চুরি করে নি তারাও হয়ে ওঠে চোর। যারা কোনোদিন খুন-খারাবির কথা কল্পনাও করে নি তারাও

সন্তানসন্ততিদের জন্য সেই কাজটিই করে। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে সরকারগুলো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে যতই শক্তিশালী করছে, কঠোর থেকে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করছে, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করছে কিন্তু কোনো লাভ নেই। অশান্তি অপরাধ ধাঁই ধাঁই করে বাড়তেই থাকবে।

জনসংখ্যার আধিক্য সমানুপাতিকভাবে মানুষের ভয়ংকর স্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি করে। আত্মার ধ্বংস, সম্পদের ধ্বংস, স্বাস্থ্যের ধ্বংস, জলবায়ুর ধ্বংস সব মিলিয়ে মানবজাতির অস্তিত্ব এখন সংকটে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে নাকি ধরণী পরম ব্রহ্মার নিকট আবেদন করেছিল যে, 'মানুষ আর মানুষের পাপের বোঝা এত বেড়ে গেছে যে আমি আর বইতে পারছি না।' তখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে ১৮ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হয়। বিগত শতাব্দীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধে ১১ কোটি মানুষ হত্যা করে পশ্চিমা সভ্যতা পৃথিবীর ভার কমিয়েছে। তারপরে আরো অর্ধকোটি মানুষকে তারা নানা যুদ্ধে হত্যা করেছে। এখনো পৃথিবী চিৎকার করে প্রভুর কাছে ভার কমানোর জন্য ক্রন্দন করছে।

এখন প্রশ্ন এসেছে এই মানুষ নামক সন্তানগুলো রক্ষা পাবে, নাকি মাতা ধরিত্রী রক্ষা পাবে? এই সিদ্ধান্ত নেবে প্রকৃতি। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভ্যালি লিখেছিলেন, "যখন এ বিশ্বের সব জায়গা এমনভাবে মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যে তারা বুঝে উঠতে পারবে না কোথায় তারা আছে, অথবা অন্য কোথাও যেতে পারবে না... তখন এ পৃথিবী নিজেই নিজেকে শুদ্ধ করে নেবে।" এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া প্রকৃতি কীভাবে বাস্তবায়ন করবে সে সম্পর্কে গণিতবিদ ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী (১৭৯৮) হচ্ছে, "জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই ধরিত্রীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি। সে- কারণে মানবপ্রজাতির মধ্যে অকাল মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে একটা সময়। মানুষের নৈতিক গুণাবলীর বিনাশের কারণে দ্রুত কমে আসবে জনসংখ্যা। ফলশ্রুতিতে মানবপ্রজাতি হয়ে উঠবে ধ্বংসযজ্ঞের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। প্রায়শই তারা লিপ্ত হবে মারামারি আর খুন খারাবির মতো কাজে। পরিবেশ বিপর্যয়, খারাপ ঋতুর আবির্ভাব, মহামারি, খরা, অতিবৃষ্টি, প্লেগের মতো ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত হবে তারা, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে, দ্রুত কমে আসবে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা। এরপরও দুর্দশার শেষ হবে না, ধেয়ে আসবে সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ, আর এই দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে অতি দ্রুত পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে সহ্যসীমার মধ্যে চলে আসবে।"

ম্যালাথাসের হিসাব-নিকাশ এখন বাস্তবতা। মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্টের চেয়েও বহুগুণ বেশি অস্ত্র প্রস্তুত করেছে। যেন একটি টাইমবোমার উপর বসে আছে মানবজাতি। ঠিক কোন্ সময় বিস্ফোরিত হবে সেটা তা আমাদের জানা নেই, তবে যে কোনো মুহূর্তে হবে। যে কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে, এমন কি অনেকেই বলছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৯/১১ এর পরই শুরু হয়ে গেছে। টাইমবোমার উপরে বসেই আমরা সংসার করে যাচ্ছি, ধ্বংস

হওয়ার জন্য সন্তানদেরকে জন্ম দিচ্ছি। পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এত বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছে যা দিয়ে এই গ্রহটিকেই বহুবার চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা সম্ভব। তবে পৃথিবী ধ্বংস অর্থাৎ কেয়ামতের সময় আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। পৃথিবী ও মানবজাতিকে নিয়ে তাঁর যে মহাপরিকল্পনা তা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে। সুতরাং সন্তানকেই বিদায় নিতে হবে। নুহ (আ.) এর সময় আল্লাহ পুরো মানবজাতিকে বিনাশ করলেও বীজস্বরূপ সত্যনিষ্ঠ কিছু মানুষকে তিনি রক্ষা করেছেন; যা এক প্রকার 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বটে। এখন তেমনিভাবেই মানবজাতির কর্মফল ভোগের সময় উপস্থিত। পৃথিবীর উপর তাদের সম্মিলিত জুলুমের ফলে তাদের এখন বিনাশ ঘটবে। আমেরিকা, রাশিয়া, সিরিয়া, ন্যাটো, ইসরাইল, আই এস- এরা সবাই এই ধ্বংসের নিমিত্তমাত্র।

কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসযজ্ঞের পর যেমন নতুন শান্তিময় যুগের সূচনা হয়েছিল, নুহের (আ.) বন্যার পর যেমন নতুন সভ্যতার সূচনা হয়েছিল তেমনি এবার আল্লাহ নতুন বিশ্বব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য হেযবুত তওহীদকে সৃষ্টি করেছেন। হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে চূড়ান্ত সত্যের দিকে আহ্বান করছে। প্রতিটি শক্তিশালী সত্যের নিজস্ব অভিকর্ষ আছে যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে নিজের কাছে টেনে আনবেই। বিশ্ব পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট সময় এসে গেছে। এখন হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে জ্ঞানের একটি বিপুল বিস্ফোরণ ঘটবে, হেযবুত তওহীদ অন্ধকার দূর করতে মানবজাতিকে বোধের আলো প্রদান করবে। মানুষকে শেষ একটি সুযোগ দেবে রসাতল থেকে দূরে সরে সত্যের পথে অগ্রসর হবার। হেযবুত তওহীদ মানবজাতির সামনে নতুন চিন্তাধারার উৎসমুখ খুলে দেবে যা মানবজাতিতে নতুন রেনেসাঁর সূচনা করবে ইনশাল্লাহ।

ঢাকা প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব আবুল কালামকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন লেখক। স্থান: ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (১৪.০১.২০১৬)

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলাদেশ

বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা ন্যূনতম খবরও রাখেন তাদেরকে বলে দিতে হবে না যে, পৃথিবী আজ কী বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছে। অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত ও ক্রমাগত সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিশ্বে যেন এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। কী উন্নত - কী উন্নয়নশীল, কী পাশ্চাত্য - কী প্রাচ্য কোনো দেশই আজ নিরাপদ নয়। শাসিতের উপর শাসকের অত্যাচার, দুর্বলের উপর সবলের যুলুম, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা আজ পৃথিবীকে নরককুণ্ডে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। মুসলমান নামক এই জাতিটি বিভিন্ন পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র লাঞ্ছিত, অপমানিতই নয়, তারা অস্তিত্বের সংকটে পতিত হয়েছে। লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে একটার পর একটা দেশে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডবে আগুন জ্বলছে। বোমার আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে শহর-নগর। লাখো মানুষ সাগরে ডুবে মরছে। শিয়া-সুন্নিসহ বিভিন্ন জাতিবিনাশী ফেরকাবাজি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। সমৃদ্ধ নগর, সম্পদশালী শহরগুলো বিরান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আর লক্ষ লক্ষ অর্থশালী মানুষ আজ নিঃস্ব পথের ভিখারী হয়ে শরণার্থী শিবিরে আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরছে। ওদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো অস্ত্রব্যবসায় মত্ত। অনেকে বলছেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক প্রকার শুরু হয়ে গেছে।

এই যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে কোনো দেশই মুক্ত থাকবে না, বিশেষ করে আমাদের মতো অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জন্য জঙ্গিবাদের উত্থান একটি ভয়াবহ নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আর ব্যস্ত থাকলে হবে না, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র রক্ষার জন্য ষোল কোটি মানুষকে নিয়েই ভাবতে হবে। জাতি আক্রান্ত হলে ব্যক্তি নিরাপদে থাকতে পারবে না।

সিরিয়ার যে অবস্থা হয়েছে বাংলাদেশেও সেটাই হোক এটা নিশ্চয়ই আমরা চাইব না। আমাদের এই এক চিলতে জমি যেখানে আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই, দাঁড়ানোর জায়গা, যার বুক চিরে আমরা সোনার ফসল ঘরে তুলি, এই প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানামুখী ষড়যন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদীদের দাবার গুটি আমরা হতে পারি না। এখন আমাদের এই এক চিলতে জমিকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে হবে। বুঝতে হবে আমাদের সংকট কী? আমরা আর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না।

৭১ এর স্বাধীনতার পরঃ

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ নামক একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেছিল। কিন্তু পরবর্তী ৪৪ বছর এ

জাতিটিকে আর ঐক্যবদ্ধ থাকতে দেয়া হয় নি। এ জন্য দায়ী প্রধানত বৈদেশিক ষড়যন্ত্র আর অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ও রাজনীতিক বিভক্তি। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন রাজনীতিক দলগুলো এ জাতিটিকে শত শত শত্রুশিবিরে ভাগ করে ফেলল। আর ধর্মীয়ভাবে জাতির মধ্যে মাজহাব ফেরকার বিভক্তি আগে থেকেই ছিল, উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্মচেতনাকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে রাজনীতিক, ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে শুরু করল। তারাও জাতিটিকে বহুভাগে বিভক্ত করে ফেলল।

তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে জাতি আজ সার্বিকভাবেই অনৈক্য, সংঘাত ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ একদিকে পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার ষড়যন্ত্র, অপসংস্কৃতির প্রসার, রাজনীতিক দলগুলোর অন্যায়, অপরদিকে ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়াবাজি, দাঙ্গা, বিদ্বেষ। মূলত এইসব কারণে আমাদের প্রিয় জন্মভূমির বাসিন্দা ষোল কোটি মানুষ একটা শক্তিশালী জাতিসত্তা গঠন করতে পারি নি। অধিক জনসংখ্যা আমাদের জন্য একটা মহা শক্তি হতে পারত।

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় শুধু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট নয়ঃ

বস্তুবাদী ভোগবাদী জীবনব্যবস্থার প্রভাবে মানুষ আজ এতটাই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে যে, নিজের লাভ-ক্ষতি ছাড়া কিছুই ভাবার সময় তার নেই। ফলে চোখের সামনে কোনো অপরাধ হতে দেখলেও মনে করে এর প্রতিবাদ করা তার দায়িত্ব নয়, এ দায়িত্ব শুধুই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। কিন্তু সত্য হলো- সমগ্র জাতি যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়, ন্যায়ের পক্ষে না দাঁড়ায়, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাকে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে না করে তাহলে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একার পক্ষে শত চেষ্টা করেও সমাজকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব নয়। এজন্য মানুষের মানসিক পরিবর্তন সাধন করতেই হবে। এটাকেই বলে প্রকৃত জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় চরিত্র নির্মাণ।

মানুষ শুধু দেহধারী নয়, তার আত্মা আছেঃ

মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব নয়, সে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক জীব। শুধু ইহকাল নয়, তার পরকালও আছে। মানুষের আত্মাই তার পরিচালক, তাই তাকে অবশ্যই এই শিক্ষা দিতে হবে যে, তার প্রত্যেকটি কাজ ও চিন্তা প্রত্যক্ষ করছেন এবং হিসাব রাখছেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ, ক্ষমতাবান স্রষ্টা। প্রতিটি মানুষকে একদিন যবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে, তার জন্য পুরস্কার ও কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তখন মানুষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর আওতার বাহিরে গেলেও অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। অন্তত অপরাধ না করার ক্ষেত্রে এবং অন্যকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের আত্মিক প্রেরণা তাকে উদ্দীপ্ত ও সুপথে পরিচালিত করবে।

মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে হাইজ্যাক করা হয়েছেঃ

আমাদের দেশের ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঈমানকে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বারবার ভুল খাতে প্রবাহিত করেছে। কেউ ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করেছে, কেউ অপরাজনীতিতে ব্যবহার করেছে, কেউ জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করেছে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় ধর্মব্যবসায়ী আলেমদের উপর নির্ভরশীল। তাদের থেকে ধর্ম শিখে সওয়াবের আশায়, ইসলামের উপকার হবে মনে করে তারা বারবার সমাজ ও জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা ধর্মকর্ম মনে করে যে উপাসনা বা রাজনীতিক কর্মকাণ্ড করছে তাতে না সমাজ উপকৃত হচ্ছে, না জাতি উপকৃত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, যে ঈমান মানবতার কল্যাণে কাজে লাগে না সেই ঈমান কাউকে জান্নাতে নিতে পারবে না। এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞাও করা যাবে না, খাটো করেও দেখা যাবে না, তাদেরকে ধর্মবিশ্বাসকে মুছেও দেওয়া যাবে না। এখন একটাই পথ তাদের এই ঈমান সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে, তাহলেই ধর্মবিশ্বাস সংকট না হয়ে বরং জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। এর জন্য গণমানুষকে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ের সৃষ্টি, সেখানে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় না।

আকিদা সহিহ না হলে ঈমানের মূল্য নেইঃ

ইসলামের সকল আলেম-ওলামা ও ফকীহগণ একমত যে- আকিদা ঠিক না থাকলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। আর স্বভাবতই ঈমানের মূল্য না থাকলে ঐ ঈমানভিত্তিক আমলেরও কোনো মূল্য থাকে না। তাই ইসলাম-শিক্ষা বইগুলোর প্রথমেই থাকে 'আকায়েদ' অধ্যায়। সেই মহামূল্যবান আকিদা কী? আকিদা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা (Comprehensive concept)। কোনো কাজ কী উদ্দেশ্যে করা হবে- সেটা জেনে বুঝে করাই আকিদা। ঘড়ির কাজ সময় দেওয়া, কলমের কাজ লেখা। এটা বোঝাই ঘড়ি ও কলম সম্পর্কে সঠিক আকিদা। এটা জানা না থাকলে সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না। একইভাবে আমাদেরকে জানতে হবে কোন কাজের পূর্ব শর্ত কোন কাজ, কোনটা আগে কোনটা পরে, কোনটা মহা গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ, কেন আমরা ঈমান পোষণ করব, ধর্ম বলতে কী বোঝায়, ধার্মিক কারা, কোন কাজটি প্রকৃত এবাদত, নবী-রসুলদের আগমনের উদ্দেশ্য কী, নামায-রোযা-হজ্ব ইত্যাদি কেন আল্লাহ করতে বলেছেন। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা বিগত ১৩০০ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে বিকৃত হয়ে গেছে। তাই মানবজাতির ধর্মবিশ্বাস থাকলেও আকিদা ঠিক নেই, ফলে আমল অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, যিকির-আজগর ইত্যাদি অনর্থক হচ্ছে। এ অবস্থা বোঝাতেই আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষের রোজা হবে না খেয়ে থাকা (উপবাস), তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা

(কবুল হবে না)। যে মহামূল্যবান আকিদা না থাকলে ঈমানের কোনো দাম থাকে না সে ব্যাপারে আমরা কতটুকু সচেতন?

ধর্ম কী? ধার্মিক কারা?

ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা। কোনো বস্তু, প্রাণী বা শক্তি যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ ধারণ করে সেটাই হচ্ছে তার ধর্ম। আগুনের ধর্ম পোড়ানো। পোড়ানোর ক্ষমতা হারালে সে তার ধর্ম হারালো। অথচ প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লেবাস ধারণ করে সুরা কালাম, শাস্ত্র মুখস্থ বলতে পারে, নামায-রোযা, প্রার্থনা করে সে-ই ধার্মিক। এটা সঠিক ধারণা নয়। মানুষের প্রকৃত ধর্ম আসলে কী? মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ে অনুভব করে এবং সেটা দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় সে-ই ধার্মিক।

এই মানবতার ধর্ম পরিত্যাগ করে বক ধার্মিকরা মসজিদে, চার্চে, মন্দিরে, প্যাগোডায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে, ওদিকে দাজ্জাল, শয়তান, আসুরিক শক্তির তাণ্ডবে সমস্ত বিশ্ব ছারখার হচ্ছে। এই অবস্থা দেখেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, "কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল ঝড়কে আমি বাঁধব, প্রকৃতিকে ধ্বংস করব। সব ছারেখারে দিয়েও আমি বাঁচব।

আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই বোন বাপ মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি? মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?

ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়–এই ভণ্ডামী থেকে চলে আয়। তোরা বল্, আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে? দাস কখনও দাসকে শেখাতে পারে? আমরা কিছু শিখব না, আমরা কিছু শুনব না; আগে বাঁচব–আমরা বাঁচব।

ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে–তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কি? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকতো? তারা কি দুশমন এলে কোর'আন পড়তে ব্যস্ত থাকতো? তাদের রণ কোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত। তারা আগে বাঁচতো।"

কাজেই মানবজাতির সুখ শান্তিই হচ্ছে ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। সে শান্তিই যদি না থাকে তবে সব ধর্মপরিচয় মিথ্যা।

এবাদত কী?

এবাদত হচ্ছে যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজটি করা। যেমন আল্লাহ সূর্য সৃষ্টি করেছেন আলো তাপ দেওয়ার জন্য, সেটা দেওয়াই সূর্যের এবাদত। তেমনি আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে (সুরা বাকারা-৩০)। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ যেভাবে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ রেখেছেন ঠিক সেভাবে এ পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই মানুষের এবাদত। ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ্ন। হঠাৎ পাশের বাড়িতে আগুন লাগল। আপনি কী করবেন? দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে, নাকি প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন? যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার এবাদত। আর যদি তা না করেন তাহলে যত তাহাজ্জুদই পড়েন সব পণ্ডশ্রম। কারণ আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য। ঐ কাজের জন্য যে আত্মিক, শারীরিক ও মানসিক চরিত্র দরকার তা অর্জনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি। যদি আসল দায়িত্ব পালন না করে কেবল আনুষ্ঠানিকতাই করে যান তাহলে আল্লাহ পরিত্যাগ তা করবেন। এ কারণেই বর্তমানে মুসলমান নামক জাতিটির কোনো আমলই আল্লাহ গ্রহণ করছেন না, বরং তারা সর্বত্র আল্লাহর অভিশাপের শিকার। পৃথিবীময় মুসলিম জাতির এই দুর্দশার এটাই কারণ।

স্বার্থপরের নামাজ নাই, সমাজ নাই, জান্নাতও নাই

আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ব্যক্তি কখনও মু'মিন-মুসলিম হতে পারে না। কারণ পবিত্র কোর'আনের সুরা হুজরাতের ১৫ নম্বর আয়াতে মু'মিন হবার শর্ত হিসেবে জীবন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করে দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সমাজ তথা মানবজাতির শান্তির লক্ষ্যে নিজেদের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে প্রচেষ্টা না করলে কারও কোনো আমলই কবুল হবে না, তারা জান্নাতেও যেতে পারবে না। অন্যদিকে সমাজ হলো একদল মানুষের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা যার অস্তিত্বের ভিত্তি হলো ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, ত্যাগ, কোরবানি। এই গুণগুলো মানুষের মধ্য থেকে হারিয়ে গেলে সেটাকে আর মানবসমাজ বলা যায় না, তখনই মানুষের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়। যে ব্যক্তি শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের চিন্তায় মগ্ন থাকে, দেশ-সমাজে যা হয় হোক, তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না, এমন স্বার্থপরের অধিকার থাকে না কোনো সমাজে বসবাস করার। মানুষকে বুঝতে হবে যে, সে আর দশটা প্রাণীর মতো সাধারণ সৃষ্টি নয়, সে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক কয়েকটা তফাৎ রয়েছে- (ক) মানুষের মধ্যে স্রষ্টার রূহ বা পরমাত্মার অংশ রয়েছে; (খ)

আল্লাহ নিজ হাতে মানুষ বানিয়েছেন। অন্য সকল সৃষ্টিকে তিনি কুন শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, (গ) মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, (ঘ) নিরন্তর মানুষের নানা প্রয়োজন মিটিয়ে যাওয়ার জন্যই সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এই মানুষ সৃষ্টির এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই মানুষও যদি কেবল পশুর মতো খায়, ঘুমায়, বংশবিস্তার করে, যাবতীয় জৈবিক চাহিদা পুরণ করে আর একটা পর্যায়ে মরে যায় তাহলে তার মানবজীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রতিটি প্রাণী কেবল নিজের জন্য বাঁচে কিন্তু মানুষ বাঁচবে অন্যের জন্য। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই আমাদের জীবন তখনই সার্থক হবে যখন আমাদের দ্বারা মানবজাতির কোনো কল্যাণ হবে। সেটারই পুরস্কার আমরা হাশরের দিনে পাব ইনশা'আল্লাহ।

আজ সমস্ত বিশ্ব যখন অন্যায় অশান্তি, যুদ্ধ, রক্তপাতে পূর্ণ তখন আমাদের সমাজ তথা প্রিয় জন্মভূমিকে যাবতীয় সন্ত্রাস, হানাহানি থেকে নিরাপদ রাখা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য।

জঙ্গিরা কোন জায়গায় ভুল করছে তা সবার কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার

সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেকগুলো সহিংস ঘটনা ঘটেছে, খুন ও খুনের চেষ্টা হয়েছে। বাংলাদেশে জঙ্গিরা যেটা করছে অর্থাৎ কুপিয়ে হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে সেটা ইসলাম সম্মত নয়। তারা বলবেন যে কোর'আনে কেতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধকে ফরদ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামে যুদ্ধ নেই এ কথা কেউ বলতে পারবে না। রসুলাল্লাহ নিজে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১০৭টি যুদ্ধ সংঘটন করেছেন। এখানে বিচার করতে হবে যে তিনি তা কখন করেছেন। রসুল সশস্ত্র যুদ্ধ তখনই করেছেন যখন তাঁর হাতে একটি রাষ্ট্রশক্তি ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ হত্যা করে যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যেত তাহলে রসুলাল্লাহ মক্কার ১৩ বছরের জীবনে সব কাফের সর্দারদের গুপ্তহত্যা করতে পারতেন। সাহাবীদের হুকুম দিলেই তারা তা বাস্তবায়ন করে ফেলতেন। কিন্তু তিনি কোনো জ্বালাও পোড়াও করেন নি, মিছিল করেন নি, হামলা করেন নি।

তাকে মক্কার রাজা হবার প্রস্তাবও করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ছল-বল-কৌশল না করে মানুষকে ধৈর্য সহকারে আল্লাহর বিধানের সুফল আর মানুষের বিধানের কুফল বুঝিয়েছেন, মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর এই কাজের ফলে একটা সময় এসেছে যখন মক্কার লোকেরা না মানলেও মদিনার সকল ধর্ম ও মতের সমন্বয়ে আপামর জনতার সমর্থনে রাষ্ট্র গঠন করেন।

প্রতিটি রাষ্ট্রের অধিকার থাকে নিজেদের সামরিক বাহিনী তৈরি করার, তাদেরকে প্রশিক্ষিত করার এবং রাষ্ট্রের সামরিক নীতি বাস্তবায়ন করার। সে অনুসারেই তিনি শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, যুদ্ধ করেছেন। রাষ্ট্রের ঐক্য-সংহতি রক্ষার জন্য অপরাধীকে দণ্ড দিয়েছেন অর্থাৎ একজন রাষ্ট্রনায়ক

হিসাবে যা করণীয় সব করেছেন।

আল্লাহর রসুল পথভ্রষ্ট জঙ্গিদের মতো সাধারণ জ্ঞানহীন ছিলেন না। উপরন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর দিক নির্দেশনা প্রাপ্ত। তিনি জানতেন যে তার ক্ষমতা দখলের চেয়ে বড় কথা তিনি একটি সভ্যতার নির্মাণ করতে চলেছেন।

জবরদস্তি করে কিছুদিন শাসন করা যায়, সাম্রাজ্যবিস্তার করা যায় কিন্তু এক সময় জনগণের সম্মিলিত বিদ্রোহের সামনে তার বিনাশও দ্রুত ঘটে। তাই মানুষকে বুঝিয়ে একটি নির্ভুল আদর্শের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার, মানুষের হৃদয় জয় করার কোনো বিকল্প নেই। এরপর আসে আল্লাহর সাহায্যের প্রশ্ন। তাঁর সরাসরি সাহায্য ছাড়া রসুলাল্লাহ ও তাঁর উম্মাহ কোনোদিনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না।

এমতাবস্থায়, অন্তত দু'টি কারণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যে ধর্মবিশ্বাসী হই না কেন, প্রতিটি ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণ। মুসলিম-সনাতন-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ হওয়ার আগে মানুষ হতে হবে। সব ধর্মের মূল কথাই শান্তি, অর্থাৎ মানুষের শান্তির লক্ষ্যে কাজ করাই ইসলামের মূল কাজ, এটাই এবাদত। এই এবাদত না করলে হাশরের দিন আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই এখন আমাদের প্রত্যেকের এবাদত ও ঈমানী দায়িত্ব হলো এই অশান্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করা।

যারা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বাসগতভাবে প্রস্তুত নয় তাদের প্রতি আমাদের কথা হলো, মানুষের নিরাপত্তাবিধানের জন্য এগিয়ে আসা এই মুহূর্তে আমাদের সকলের সামাজিক কর্তব্য। আমরা এই সমাজে বাস করছি, এই সমাজের অস্তিত্ব আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব। তাই এই সমাজের প্রতি, এ জাতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আজকে বিশ্বের মানুষ যখন অশান্তির মধ্যে আছে তখন তা থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। সুতরাং যেদিক দিয়েই দেখি, এখন আর আত্মকেন্দ্রিক থাকলে আমাদের চলবে না।

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। আমরা ষোল কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে।

হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্যের ধরন

আমরা বিশ্বাস করি একটি জনগোষ্ঠীকে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার মতো অতি মহান ও বিরাট কাজের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হবে মানুষকে বোঝানো। মানুষের মনের উপর জোর চলে না। তাকে এটা বোঝানো যে, স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন জীবনব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করার কারণে মানবজাতি যে অশান্তির মধ্যে আছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দেওয়া চিরন্তন, শাশ্বত, ভারসাম্যপূর্ণ, চিরসত্য, সনাতন জীবনব্যবস্থায় তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এক কথায় তাদেরকে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ বিষয়টি মুখে বলে, হ্যান্ডবিল দিয়ে, বই লিখে, পুস্তিকা আকারে, পথসভা, জনসভা, আলোচনা সভা, সেমিনার, মতবিনিময় সভা, গোলটেবিল বৈঠক, সংবাদ সম্মেলন, ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও প্রদর্শন, পত্রিকা প্রকাশ, ম্যাগাজিন প্রকাশ, বইমেলায় অংশগ্রহণ, নাটক, গান, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, চিঠি লিখে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, ওয়েব সাইটের মাধ্যমে- এক কথায় যতভাবে পারা যায় যুক্তি দিয়ে এই সত্যটি জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে জেহাদ। বাংলায় বলা যায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আমরা এই পথগুলো অবলম্বন করে কাজ করে যাচ্ছি। বোমা মেরে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে, শ্রেণি শত্রু বা বিরুদ্ধবাদীদের মেরে ফেলে, জোরপূর্বক, হিংসাত্মক, সহিংস পন্থায় একটি আদর্শ (Ideology, thought) জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে ওগুলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থা নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে তলোয়ার সারা জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই তলোয়ার এক দিন রসুলাল্লাহর পায়ে সোপর্দ হয়ে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। যে ওমর (রা.) মহানবীকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন সেই ওমর (রা.) মহানবীর আদর্শে নিজেকে সমর্পণ করে ইসলামের মহান সেবকে পরিণত হয়েছেন। একেই বলে আত্মিক পরিবর্তন।

আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্যঃ

মানবজাতির বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ স্রষ্টার বিধান। মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটিসহ সমস্ত মানবজাতি আজ তার সমষ্টিগত জীবন মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে পরিচালনা করছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই, মানুষের জীবন সংঘর্ষ, রক্তপাত, অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হয়ে আছে। মানুষের

তৈরি এই বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র এ সমস্যাগুলোর সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে, এমন কি পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। হেযবুত তওহীদের বক্তব্য এই যে, শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বর্তমান জীবনব্যবস্থা (System) বাদ দিয়ে স্রষ্টার, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তা সমষ্টিগত জীবনে কার্যকর করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম নামে যে ধর্মটি চালু আছে সেটা আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম নয়। গত ১৪০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। আল্লাহ অতি দয়া করে তাঁর প্রকৃত ইসলাম যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়েছেন। হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত ইসলামের ধারক।

ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের কোন বিনিময় চলে না। বিনিময় নিলে ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। কাজেই ধর্মের কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং বিনিময় নিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছ থেকে।

সহজ সরল সেরাতুল মোস্তাকীম দীনুল হক ইসলামকে পণ্ডিত, আলেম, ফকীহ, মোফাস্‌সেরগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বহু মতের সৃষ্টি করেছে। ফলে একদা অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী হাজারো ফেরকা, মাজহাব, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে। ভারসাম্যহীন সুফিরা জাতির সংগ্রামী চরিত্রকে উল্টিয়ে ঘরমুখী, অন্তর্মুখী করে নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। ফলে একদা অর্ধ্ব-বিশ্বজয়ী দুর্বার গতিশীল যোদ্ধা জাতিটি আজ হাজার হাজার আধ্যাত্মিক তরিকায় বিভক্ত, স্থবির উপাসনাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণির কাজের ফলে ইসলামের উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে ধর্মের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মার উন্নয়ন এবং জীবনের ব্যক্তিগত অঙ্গনের ছোট খাটো বিষয়ের মাসলা মাসায়েল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা। ফলে বর্তমানে যে যত বেশি মাসলা জানে ও চর্চা করে সে তত বড় মো'মেন আর যে যত বেশি অন্তর্মুখী সাধক সে তত বড় বুজুর্গ হিসাবে সমাজে সমাদৃত। কিন্তু আল্লাহর চোখে এই জাতি মো'মেন নয়, উম্মতে মোহাম্মদী নয়। তার প্রমাণ পৃথিবীময় এদের লাঞ্ছনা, দুর্দশা যা আল্লাহর লা'নতের পরিণাম।

আমাদের উদ্দেশ্যঃ

ধর্মের নামে চলা অধর্মসমূহকে চিহ্নিত করা এবং ধর্মব্যবসায়ীদের কায়েম করে রাখা সেই মিথ্যাগুলোকে কোর'আন, হাদিস, ইতিহাস, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, যুক্তি, তথ্য, উপাত্ত দ্বারা অপনোদনের চেষ্টা করা।

আমাদের লক্ষ্যঃ

মানবজাতিকে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করে

মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

কাঠামোঃ

আমাদের এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তিনি ছিলেন আন্দোলনের উদ্যোক্তা, আহ্বানকারী, প্রতিষ্ঠাতা এমাম। বিভিন্ন স্থানে তাঁর সঙ্গে যারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে তিনি একজন দায়িত্বশীল বা আমীর নিয়োগ করেছেন। কয়েকজন আমীরকে পরিচালনা করার জন্য একজন আঞ্চলিক আমীর ছিলেন। এখনো সেই কাঠামোই বিদ্যমান আছে। এক কথায় আমাদের আনুগত্যের ধারাবাহিকতা হলোঃ এমাম-আমীর-সদস্য/সদস্যা (মোজাহেদ/মোজাজেদা)।

ঐকমত্য পোষণ করার প্রক্রিয়াঃ

আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিকে বিবৃত করে একটি লিখিত ফর্ম আছে কেউ চাইলে সেটায় তার নাম ঠিকানা লিখে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। অথবা সমাবেশে হাত তুলে আমাদেরকে সমর্থন জানাতে পারেন। অথবা অন্তর থেকে আমাদেরকে সমর্থন দিতে পারেন। এক কথায় যারাই সত্যকে ধারণ করবেন, সত্যের পক্ষ অবলম্বন করবেন তারা সবাই আমাদের বন্ধু, ভাই, সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী। তারা যে বর্ণের, যে গোত্রের, যে ধর্মের হোন না কেন।

আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ধরনঃ

হেযবুত তওহীদ আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল তখন আমাদের এই সত্য প্রকাশে একটি শ্রেণি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তারা হচ্ছে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি। তাদের বড় ভীতির কারণ হচ্ছে ধর্মের কাজ করে টাকা নেওয়া যে হারাম এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা খ্রিষ্টানদের তৈরি তা মাননীয় এমামুয্যামান প্রকাশ করে দিয়েছেন। তারা হেযবুত তওহীদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করার জন্য প্রচার করতে শুরু করল যে হেযবুত তওহীদ খ্রিষ্টান, কাদিয়ানী হয়ে গেছে, এমামুয্যামান নবী দাবি করেছেন ইত্যাদি। তারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ওয়াজে, খোতবায় ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে তার ফলে সাধারণ মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। বহু স্থানে আমাদের সদস্যদের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে, গ্রাম থেকে উৎখাত করা হয়েছে, নির্মম প্রহারে আহত করা হয়েছে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে ফেলা হয়েছে।

এরই মধ্যে সারা পৃথিবীতে শুরু হয় ইসলামের নামে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড। তখন পশ্চিমা ভাবধারায় বিশ্বাসী ইসলামবিদ্বেষী গণমাধ্যমগুলো হেযবুত তওহীদকেও সন্দেহবশত জঙ্গি দল বলে প্রচার করতে আরম্ভ করে। একটি মিডিয়ার প্রচারে অন্যান্য মিডিয়া প্রভাবিত হয়, সারা দেশবাসীও প্রভাবিত হয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও প্রভাবিত হয়। কিন্তু কেউ একবারও যাচাই করে না যে হেযবুত তওহীদের কাছে গিয়ে দেখি তো আসলে তারা কী বলে বা কী করতে

চায়। তাদের অপপ্রচারের ফলে আমাদেরকে সীমাহীন প্রশাসনিক নির্যাতনের মুখোমুখী হতে হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে সন্দেহমূলকভাবে ৪৬৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যাতে আমাদের হাজার হাজার সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন। গ্রেফতার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমগুলো একাট্টা হয়ে ফলাও করে ছবিসহ সংবাদ প্রচার করেছে। কিন্তু মামলা যখন আদালতে গেছে এবং তদন্ত করা হয়েছে তখন একটি মামলাতেও আমাদের একজন সদস্যেরও কোনো অপরাধ বা আইনভঙ্গ প্রমাণিত হয় নি। ফলে আমাদের সদস্য-সদস্যারা আদালতের সিদ্ধান্তে অভিযোগ থেকে বে-কসুর খালাস পেয়েছেন। বিগত বিশ বছরে আমাদের একজন সদস্যও আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হন নি। কিন্তু তাদের এই নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার সংবাদ কেউ প্রচার করে নি। ফলে জনগণের কাছে হেযবুত তওহীদ জঙ্গি দল হিসাবেই পরিচিত থেকে যায়। আমরা যতই প্রতিবাদ পাঠিয়েছি, পত্রিকাগুলো তা প্রকাশ করে নি এমন কি প্রতিবাদ দিতে গেলেও পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিয়েছে।

তারা যে মিথ্যাচারগুলো করেছে তার মধ্যে কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। যেমনঃ

১. হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয় এবং নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণও নেই। তথাপি কয়েক হাজার বার পত্রিকায় হেযবুত তওহীদকে 'নিষিদ্ধ সংগঠন' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। ছোট খাটো পত্রিকা থেকে দেশের সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকাগুলোও এই কাজ বহুবার করেছে।

২. কিছুদিন পর পর তারা লিখে যে, 'অচিরেই নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ'। এটা লেখার উদ্দেশ্য সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করা যাকে বলে force one's hand. এর ফলও হয়ে। সরকার যার পর নাই প্রভাবিত হয়েছে। তারা বেশ কয়েকটি সংগঠনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। এই তালিকার নাম দেওয়া হয়েছে কালো তালিকা। আমরা চাই আমাদের কাজ সরকার জানুক কারণ আমরা একটি আদর্শ প্রচার করছি সেটা যত বেশি মানুষ জানবে ততই আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। তাই আমাদের উপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ সরকার করবে এটা আমাদেরও চাওয়া যেন কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশও না থাকে। কিন্তু ঐ নেতিবাচক শব্দ 'কালো তালিকা' আমাদের সঙ্গে যায় না। একটি আইন মান্যকারী দল যাদের আইনভঙ্গ করার একটিও নিদর্শন আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নি, যেখানে হাজার হাজার পুলিশ, র‍্যাব, সেনা সদস্য পর্যন্ত আইনভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে সাজা লাভ করেন, সেখানে আমরা আইন মান্য করার অনন্য রেকর্ড স্থাপন করেছি। এমন একটি ন্যায়নিষ্ঠ আন্দোলনকে আরো কয়েকটি জঙ্গিদলের সঙ্গে এক কাতারে ফেলে আমাদের উপর চরম অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে। আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ দিয়েছি কিন্তু সেটা আমলাদের লাল সুতোয় বন্দী হয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যেই। এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই অবিচারমূলক কালো তালিকার কারণে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে নতুন করে অপপ্রচারের একটি বড় ইস্যু পেয়ে যায় ইসলামবিদ্বেষী

গণমাধ্যমগুলো। তারা আরো জোরে সোরে লিখতে থাকে, 'অচিরেই নিষিদ্ধ হচ্ছে কালো তালিকাভুক্ত হেযবুত তওহীদ'। এই কালো তালিকাভুক্তির কারণে আমরা বহু জায়গায় অনর্থক হয়রানির শিকার হয়েছি, অথচ এর কোনো আইনগত ভিত্তিই নেই। আদালতে যখন আমাদের সদস্যদেরকে ওঠানো হয়েছে, সরকারি উকিল যুক্তি হিসাবে বলেছেন, হেযবুত তওহীদ কালো তালিকাভুক্ত। তখন বিজ্ঞ বিচারক জানতে চেয়েছেন, নিষিদ্ধ কি না বলেন। উকিল বলেছেন, 'না, নিষিদ্ধ নয়।' তখন বিজ্ঞ বিচারক সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে মুক্ত করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। কোনো আইনগত ভিত্তি না থাক সত্ত্বেও হয়রানি কোনো অংশে কম হচ্ছে না। যারা আমাদের বিরোধী তারা একে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, মেঘ যতই ঘন হোক তার পেছনে সূর্য আছে। সত্য একদিন তার সত্যিকার রূপে উদ্ভাসিত হবে, সেদিন মিথ্যাবাদীদের চেহারাটাও মানুষ ভালো করে চিনে নেবে।

৩. তারা অপর কোনো নিষিদ্ধ বা সরকারবিরোধী ইসলামী দলের সঙ্গে হেযবুত তওহীদের সম্পৃক্ততা আছে বলে প্রচার করেছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে বহুবার আদালতে প্রমাণিত হয়েছে।

৪. বিদেশী জঙ্গিগোষ্ঠীর থেকে তহবিল আসে বলে প্রচার করেছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে বহুবার আদালতে প্রমাণিত হয়েছে।

৫. নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীরের সঙ্গে হেযবুত তওহীদের নামের আংশিক মিলকে উপজীব্য করে দুটো সংগঠনকে একই বলে প্রচার করা হয়েছে। অথবা এমন কলা-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যেন পাঠক বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হয়। এজন্যও আমাদের বহু সদস্যকে হিযবুত তাহরীর বলে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং স্বভাবতই তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

৬. বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিছু শব্দ ব্যবহার করে হেযবুত তওহীদের বিষয়ে জনমনে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিতে চেষ্টা করেছে। হেযবুত তওহীদের কোনো জঙ্গি কর্মকাণ্ড নেই তা তারা ভালো করেই জানে। কিন্তু হয়রানি তো করতেই হবে যেহেতু ইসলামের কথা বলে। কাজেই কতগুলো শব্দ তারা ব্যবহার করতে থাকে যেমন বিতর্কিত, রহস্যময়, এলাকাবাসী উদ্বিগ্ন, মাথাচাড়া দিচ্ছে, আস্তানা, আতঙ্ক বিরাজ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

৭. কিছুদিন পর পর অনেক পুরাতন একটি তালিকা বের করে যেখানে বাংলাদেশে সক্রিয় জঙ্গিদলগুলোর নামের সঙ্গে হেযবুত তওহীদের নামও জুড়ে দেওয়া হয়। জঙ্গি দলের তালিকায় আমাদের নাম পড়তে পড়তে জনগণ তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়ে যায়। একটি মিথ্যা একশ বার বলে তারা মিথ্যাকেই সত্য বানিয়ে দেয়।

হাজার হাজার মিথ্যার বিরুদ্ধে আমরা একটি সত্যের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমরা ভয়াবহ প্রতিকূলতার মধ্যেও পথ থেকে সরে যাই নি। যার সুফল আমরা

এখন পাচ্ছি। পাহাড়সমান অপপ্রচারের নিচে যে সত্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সেই সত্য এখন আল্লাহর দয়ায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করার তওফিক আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। **আমরা সারা দেশে গত তিন বছরে ৪০ হাজারেরও বেশি পথসভা, সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। লক্ষ লক্ষ হ্যান্ডবিল, বই, পুস্তিকা প্রকাশ করে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করছি যার নাম দৈনিক বজ্রশক্তি।** এর আগে দৈনিক দেশেরপত্র ও দৈনিক নিউজে আমাদের বক্তব্য মুক্তভাবে প্রকাশ করেছি।

হেযবুত তওহীদ ২০ বছর যাবৎ এ দেশের মানুষকে যাবতীয় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে সচেতন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় এদেশের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সাংসদ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজকর্মীসহ আপামর জনগণ আমাদেরকে সমর্থন জানিয়েছেন।

কিন্তু একটি শ্রেণির গণমাধ্যম আমাদেরকে গোড়া থেকেই একচোখে দেখছেন। আমরা যে সারা দেশে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জাতিকে সচেতন করে তোলার জন্য এত চেষ্টা করলাম তা যেন তারা দেখতেই পান নি। অথচ সারা দেশে লক্ষ লক্ষ সংবাদকর্মী। কোথাও হেযবুত তওহীদের একজন সদস্যও যদি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার হন সেই সংবাদ পত্রিকায় এসেছে, সারাদিন ধরে টিভিতে প্রচার করা হয়েছে। এর মানে কী?

এর মানে বুঝতে হলে আমাদেরকে রসুলাল্লাহর একটি হাদিস স্মরণ করতে হবে। তা হলো দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে অর্থাৎ আত্মার দিক, ত্যাগের দিক, সত্যের দিক, ন্যায়ের দিক দাজ্জাল দেখতে পাবে না। সে কেবল বাইরের দিক, ভোগের দিক, মিথ্যার দিকটাই দেখতে পাবে।

ডান এবং বামের মধ্যে ডানকে নেয়া হয় উত্তম ও বামকে নেয় হয় অধম হিসাবে। কেয়ামতের দিন জান্নাতীদের আমলনামা, তাদের কাজের রেকর্ড বই দেয়া হবে ডান হাতে, জাহান্নামীদের দেয়া হবে বাম হাতে (সুরা হাক্কাহ - ১৯, ২৫ ও সুরা ইনশিকাক- ৭)। দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মা ডান দেহ বাম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সত্য ডান মিথ্যা বাম, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে পরকাল ডান, ইহকাল বাম, জড় ও অধ্যাত্মের মধ্যে অধ্যাত্ম ডান জড় বাম ইত্যাদি। ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ডান চোখ অন্ধ অর্থাৎ জীবনের ভারসাম্যের একটা দিক, আত্মার দিক, পরকালের দিক, অদৃশ্যের (গায়েব) দিক, সত্যের দিক সে দেখতে পায় না, তার সমস্ত কর্মকাণ্ড জীবনের শুধু একটা দিক নিয়ে, দেহের দিক, জড় ও বস্তু দিক, যন্ত্র ও যন্ত্রের প্রযুক্তির দিক, ইহকালের দিক, কারণ শুধু বাম চোখ দিয়ে সে জীবনের ঐ একটা দিকই দেখতে পায়। তাই বিশ্বনবী (দ.) বলেছেন, দাজ্জালের ডান চোখ

অন্ধ হবে। এই ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' শক্তিশালী দুরবীন দিয়ে তার বাঁ চোখ দিয়ে এই মহাবিশ্ব, এই বিশাল সৃষ্টিকে দেখতে পায়। কিন্তু তার ডান চোখ অন্ধ বলে এই সৃষ্টির স্রষ্টাকে দেখতে পায় না; অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল মহাকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু যে এক অলংঘনীয় বিধানে বাঁধা আছে তা দাজ্জাল তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু ডান চোখ নেই বলে এই মহাবিধানের বিধাতাকে দেখতে পায় না। শিশুর জন্মের আগেই মায়ের বুকে তার খাবারের ব্যবস্থা করা আছে তা দাজ্জালের চিকিৎসা বিজ্ঞান তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু যিনি এ ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই মহা ব্যবস্থাপককে সে দেখতে পায় না কারণ তার ডান চোখ অন্ধ। **এই কারণে দাজ্জালের জীবনব্যবস্থা ও দর্শনে বিশ্বাসী গণমাধ্যমগুলোও আমাদের জাতির কল্যাণে সারাদেশ জুড়ে এই যে কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছি, কোনো কাজকেই দেখতে পান না, ফলে তাদের প্রচারে ছিটেফোঁটাও স্থান পায় না। কিন্তু কোন সংবাদে আমাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা যাবে সেটার দিকেই তাদের ওঁৎ পেতে থাকা দৃষ্টি কখনো ক্লান্ত হয় না।**

আমাদের সম্পর্কে লেখার আগে তথ্যটা যাচাই করে নিন

মিডিয়ার প্রতি আমরা কখনো এমন দাবি করব না যে, আপনারা আমাদের পক্ষে লিখবেন। আমরা শুধু এটুকু বলি, আমরা যা বলি এবং যা করি তা লিখুন। আমরা যা বলি না, করি না, যে কাজ আমাদের অভীষ্ট নয় এমন বিষয় আমাদের উপরে আরোপ করা কোনো নীতিতে পড়ে না। মিথ্যা বলা কোনো আইনেই বৈধতা দেয় না। তাই দয়া করে মিথ্যা লিখবেন না। মানবসমাজে কী করে শান্তি আসতে পারে, আসন্ন বিশ্ব ধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ থেকে এই জাতিকে কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে তা প্রচার করা, সমাজের সার্বিক কল্যাণার্থে একটি নির্ভুল আদর্শ আইন-সম্মতভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, মানবাধিকার, মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার। জনগণ যদি আমাদের বক্তব্যকে ভুল, অসঙ্গত, যুক্তিহীন বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমাদের কোনো কিছু বলার নেই। আমরা নিজেদের বিবেকের কাছে এবং স্রষ্টার কাছে সাফ থাকলাম যে যেই সত্যটি স্রষ্টা আমাদেরকে দান করেছেন তা আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি।

একটি নির্বাচন আসলে আমরা দেখি রাজনীতিক দলগুলো তাদের প্রত্যেকের মার্কা বা প্রতীক ভোটারের সামনে উপস্থাপন করে। জনগণ যাকে খুশি ভোট দেয়। এই প্রতীক উপস্থাপন করতে পারার অধিকার প্রত্যেক বৈধ দলের যেমন রয়েছে, তেমনি আমাদেরও একটি বক্তব্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করার অধিকার রয়েছে। আমরাও সেই 'গণতান্ত্রিক' অধিকারের বেশি কিছু আশা করি না।

মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টাই আমাদের অনন্যতা

হেযবুত তওহীদ নিঃস্বার্থভাবে মানবতার মুক্তির জন্য, দেশ ও জাতির কল্যাণের

জন্য কাজ করছে - এই কথাটি বর্তমানের স্বার্থকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গণমাধ্যমের একটি বড় অংশও হেযবুত তওহীদের কার্যক্রমকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত যে, এদের কাজ তো বাইরে থেকে ভালোই মনে হয়, কিন্তু আসলে তাদের কী অভিসন্ধি? এইভাবে হেযবুত তওহীদকে বুঝতে ব্যর্থ হয়ে গত ২০ বছর ধরে এক শ্রেণির গণমাধ্যম কেবল অপপ্রচারই চালিয়ে গেছে এবং জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করে গেছে। তারা কোনোভাবেই প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে হেযবুত তওহীদকে মেলাতে পারছেন না, তাই অনুমান করে মিথ্যাচার করছেন। সমগ্র বিশ্বে যেখানে স্বার্থের জয়জয়কার, যেখানে ধর্মও স্বার্থের হাতিয়ার, সেখানে হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যরা কী জন্য দিনরাত আন্দোলনের কাজ করে যাচ্ছে। তারা এত অনুষ্ঠান করছে, টাকা পাচ্ছে কোথায়? এ বিষয়টি বুঝতে হলে আন্দোলনের কয়েকটি মূলনীতি ও আদর্শ জানা জরুরি।

আমাদের মহামান্য এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, মানুষের জীবন এবং সম্পদ অন্য মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার মধ্যেই রয়েছে মো'মেনের জীবনের এবং মানুষের জীবনের ইহকাল এবং পরকালের সফলতা। আমি যদি আমার জীবন-সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় না করি, আমি কাফের হয়ে যাব, মো'মেন হতে পারব না। মাননীয় এমামুয্‌যামানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য মানুষের কল্যাণে, সমাজে সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যারা 'হেযবুত তওহীদ' আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই সমাজের খেটে খাওয়া শ্রেণির দরিদ্র সাধারণ মানুষ, যাদের তিনবেলা অন্ন সংস্থান করাই কষ্ট হয়ে যায়। তথাপিও তারা তাদের উপার্জনের একটি বড় অংশ আন্দোলনের কাজে ব্যয় করে থাকেন। অতীতে যারাও বা কিছুটা অবস্থাসম্পন্ন ছিলেন বা ভালো চাকরি করতেন তাদের অধিকাংশই নিজেদের জমি-জমা, সম্পদ এমনকি ঘরবাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তারাও এখন হকারি করে চলেন, রিক্সা চালান, কায়িক শ্রমের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং সেখান থেকেই আন্দোলনের ব্যয়ভার বহনে সহযোগিতা করেন। আমাদের এমামুয্‌যামানও তাঁর সমস্ত কিছু এ আন্দোলনের জন্য দান করে গেছেন। তারপর যখন কোনো সভা হয়, সেমিনার হয় বা কোনো বই ছাপানো দরকার হয়, হ্যান্ডবিল প্রয়োজন হয় তখন তারা তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিয়ে অর্থ উত্তোলন তার ব্যয় নির্বাহ করছেন।

আর্থিকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা মামলায়। আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে মামলার পেছনে। ধর্মব্যবসায়ী ও মিথ্যাশ্রয়ী গণমাধ্যমের অপপ্রচারের কারণে আমাদের বিরুদ্ধে প্রায় পাঁচশ মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে, শুধু গ্রেফতার করে হয়রানি করা হয়েছে হাজার বারেরও বেশি। মাসের পর মাস আমাদের নির্দোষ কর্মীরা জেল খেটেছেন। তাদের পরিবারগুলো বার বার জীবিকা

হারিয়ে কী অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন এটা কাছ থেকে কেউ না দেখলে বিশ্বাস করবে না। এসব মামলার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদেরকে অকল্পনীয় পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনেকে গায়ে খেটে, রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে, মুড়ি বিক্রি করে, হকারি করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তারপর জামিন হওয়ার পরও বছরের পর বছর হাজিরা দিয়ে যেতে হয়েছে, এক জেলা থেকে আর এক জেলায়, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়ে বিরাট ত্যাগ ও কষ্ট তারা স্বীকার করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। আল্লাহ যেদিন চাইবেন সেদিন এই নির্যাতন ও অন্যায়ের অবসান অবশ্যই হবে।

অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে আমরা নিজেরাই নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়েই মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের অর্থের উৎস কী এ প্রশ্নের এটাই হচ্ছে উত্তর। এখন কেউ যদি এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হন তাহলে আমরা বলব, আপনি মেহেরবানী করে আমাদের সঙ্গে একটু থাকুন এবং স্বচক্ষে দেখুন আমরা কীভাবে আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করি।

হেযবুত তওহীদের কিছু মৌলিক নীতি

আন্দোলন প্রতিষ্ঠার শুরুতেই এমামুয্যামান এটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বুনিয়াদি সিদ্ধান্তকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। সেগুলো আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলি।

১. এমামুয্যামান নীতি নিয়েছিলেন যে, আমাদের কোনো গোপন কর্মকাণ্ড থাকবে না। সবকিছু হবে দিনের আলোর মতো প্রকাশ্য। আল্লাহর রসুলের জীবন ছিল চূড়ান্ত প্রকাশ্য। তাঁর নবুয়তী কর্মকাণ্ডের প্রতিটি বিষয়তো বটেই, এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একেবারে একান্ত বিষয়গুলো পর্যন্ত ইতিহাসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করা আছে। আমাদের আন্দোলনেরও সেই নীতি। ন্যায় কাজে গোপনীয়তার প্রয়োজন হয় না, বরং যে কোনো গোপনীয়তা সন্দেহের সৃষ্টি করে যা সব সময় ক্ষতিকর।

২. আমাদের সমস্ত প্রচার কাজ সরকারকে ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানিয়ে করব। কারণ সরকার জাতির মস্তকের ন্যায় আর জনগণ দেহের নয়। আমরা যা করছি তা জাতিগঠনমূলক কাজ। আর জনগণকে নিয়ে কোনো কাজ করতে হলে সরকারকেই আগে জানানো প্রয়োজন। সরকারকে অন্ধকারে রেখে জাতির কল্যাণে ব্যাপক কোনো কাজই করা সম্ভব নয় বিশেষ করে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৬ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো বিরাট কাজ করার প্রশ্নই আসে না।

৩. কোথাও যদি আমরা আক্রান্ত হই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আইন-আদালতের আশ্রয় নিই। কারণ দেশে একটি বিচার-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় আইন

নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কোনো অধিকার কারো থাকে না। একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অবশ্যই আইনের আশ্রয় নিতে হবে এবং আমরা তা করি। বরং আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ আইন আদালতের তোয়াক্কা না করে গায়ের জোরে আমাদের সঙ্গে বহু অন্যায় করেছে। আমাদের বহুজনকে আক্রমণ করে আহত-পঙ্গু করেছে এমন কি হত্যাও করে ফেলেছে। তবুও আইন মান্য করার নীতিতে আমরা অটল আছি।

৪. আন্দোলন চালাতে অনেক খরচ আছে। এ বিষয়ে এমামুয্যামান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হেযবুত তওহীদের সদস্য নয় অর্থাৎ যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা ঐক্যবদ্ধ হয় নি তাদের থেকে আমরা একটি পয়সাও আমরা নেব না। আল্লাহ রহমে আজ পর্যন্ত এই আন্দোলন বাইরের কারো থেকে একটি টাকাও নেয় নি এবং নেবেও না। অনেক দলের সঙ্গে এক পাল্লায় যারা হেযবুত তওহীদকে পরিমাপ করতে চান তারা মনে করেন যে, বিদেশ থেকে কেউ হেযবুত তওহীদকে টাকা দেয়। এই পৃথিবীতে এক আল্লাহ এবং সত্য ধারণকারী একদল মানুষ ছাড়া আমাদের আর কোনো বন্ধু নেই। কাজেই বিদেশ থেকে টাকা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমাদের এই নীতিটি তাদের জানা থাকা প্রয়োজন। হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সদস্যরা নিজেদের উপার্জন থেকেই মানবতার কল্যাণে আল্লাহর রাস্তায় দান করেন।

৫. এমামুয্যামানের আরো একটি নির্দেশ আছে যে, এ আন্দোলনের কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকবে না, সবাইকে জীবিকা নির্বাহের জন্য বৈধ উপায়ে কোনো না কোনো কাজ করতে হবে।

৬. হেযবুত তওহীদের কেউ আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারবে না, কোনো অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যেতে পারবে না। কেউ যদি অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যায় তাকে এমাম নিজেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করবেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নবী যেভাবে করেছেন সেভাবেই চেষ্টা করতে হবে। রসুলাল্লাহ মানুষকে আল্লাহর বিধান মানার সুফল ও না মানার কুফল বুঝিয়েছেন, মানুষকে সত্যের পক্ষে মিথ্যার বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করেছেন। এজন্য তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে মক্কার ১৩ বছরের জীবনে অবর্ণনীয় নির্যাতন, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু তারা কখনো প্রত্যাঘাত করেন নাই। আমাদেরও সেই নীতি। তাই এমামুয্যামান নির্দেশ দিয়েছিলেন, সত্য প্রচার করতে গিয়ে তোমাদেরকে যদি কেউ গালি দেয়, অপমান করে, মারে, কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলে সব সহ্য করবে। কারণ আমরা রসুলাল্লাহর জীবনে সেটাই দেখেছি। তাঁর চোখের সামনে বহু সাহাবীকে নির্যাতন করা হয়েছে, তিনি বলেছেন 'সহ্য করো, সুদিন আসবে, আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে।' সত্যিই সুদিন এসেছিল, মানুষ একটা সময়ে রসুলাল্লাহর ডাক বুঝতে পেরেছিল। তখন অর্ধ দুনিয়ায় অনাবিল শান্তি নেমে এসেছিল, মুসলিমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এর ভিত্তিতে ছিল উম্মতে মোহাম্মদীর সেই ধৈর্য ও সহনশীলতা।

৭. হেযবুত তওহদ কখনো প্রচলিত ধারার রাজনীতিতে যাবে না। কারণ পশ্চিমা সভ্যতার তৈরি করা মিথ্যাপূর্ণ রাজনীতিক সিস্টেমে মিথ্যার সঙ্গে আপোশ করতে মানুষ বাধ্য হয়। আমরা কোনো প্রকার মিথ্যার সঙ্গেই আপোস করব না। তাই আমরা যে কার্যক্রম চালাচ্ছি তার পেছনে আমাদের কোনো রাজনীতিক স্বার্থ আছে এমন ধারণা যারা করেন তারা ভুল করেন। তারা এটা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আমরা কোনোদিন ভোটাভুটিও করব না বা কারো ক্ষমতার অংশীদারও হতে চাইব না। এ কারণেই হেযবুত তওহীদ একটি সম্পূর্ণ অরাজনীতিক আন্দোলন। আমরা শুধু চাই দেশটি শান্তিময় হোক। শান্তির জন্য অনেকেই প্রয়াস করছেন কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, শান্তির পথ তাদের কাছে নেই। সেটা আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দিয়েছেন। আল্লাহ কাকে তাঁর সত্য দান করবেন, কাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন সেটা তার জ্ঞানের মধ্যে আছে। হেযবুত তওহীদকে তিনি সত্য দান করেছেন, সংকট থেকে মুক্তির পথ দান করেছেন। তাই এ পথটি আমাদের কাছে একটি আমানত হয়ে দাঁড়িয়েছে যা মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। যদি মানুষ তা গ্রহণ করে তাহলে লাভ হচ্ছে আমরা সবাই মিলে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজে বাস করতে পারব, আর সেটাই আমাদের সার্থকতা, সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এ কাজের বিনিময় আমরা আল্লাহর কাছে আশা করি, মানুষের কাছ থেকে একটি ইটের টুকরোও আমরা গ্রহণ করব না।

রাজনীতিকরা ভুল ব্যবস্থার কারণে চরিত্র হারাচ্ছেন

দাজ্জাল অর্থাৎ পশ্চিমা বস্তুবাদী ভোগবাদী সভ্যতার সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হাদিসে এবং বাইবেলে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে তার নাম। দাজ্জাল শব্দের অর্থ হচ্ছে চাকচিক্যময় প্রতারক। তার প্রতিটি জিনিসের বাইরেটা খুবই মনোহর, আকর্ষণীয় কিন্তু ভিতরটা মিথ্যা আর প্রতারণা দিয়ে পূর্ণ। অপর একটি হাদিসে তাকে মসীহ আল কায্যাব বা মিথ্যা দিয়ে আবৃতকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদের আবিস্কৃত (Deviced) কয়েকটি প্রতারণামূলক শব্দ হচ্ছে গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, মানবাধিকার, আইনের শাসন, বিশ্বায়ন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ, নারীর ক্ষমতায়ন, বাক-স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, অ-সাম্প্রদায়িকতা, উন্নত-উন্নয়নশীল-অনুন্নত বিশ্ব। প্রতিটি শব্দের অর্থ একরকম আর বাস্তবায়ন তার উল্টো। প্রতিটি শব্দ একেকটি মরীচিকা।

এই শব্দগুলোর ফাঁদে পা দিয়েছে আমাদের জাতি ও জাতির নেতৃবৃন্দ। তারা এই শব্দগুলোই রাজনীতির মঞ্চে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন যে এগুলো হবে। তারা যখন এই মিথ্যা মতবাদগুলোকে ভিত্তি করে রাজনীতি শুরু করেন তখন তারাও প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলতে, কথা দিয়ে কথার

খেলাফ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তারাও জনগণের সামনে প্রতারক বলে চিহ্নিত হন। একটি রাস্তা যদি বাঁকা হয় গাড়ি কীভাবে সোজা চলতে পারে?

তারা অনেকেই হয়তো তাদের পূর্বসুরী রাজনীতিকদের সততার ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবার মানসিকতা নিয়ে রাজনীতির মাঠে পদার্পণ করেন, কিন্তু মাঠে খেলতে নেমে দেখেন সাজানো খেলা। এখানে সততার কোনো মূল্য নেই, প্রতারণা আর মিথ্যাই এখানে মূল সুর। তখন রাজনীতির মাঠে টিকে থাকতে হলে তারও দুর্নীতি, প্রতারণা, কূটকৌশল অবলম্বন করা ফরজ হয়ে যায়। ফলে তো সেই স্বাদই থাকে যা বৃক্ষ তাকে দান করে। এভাবে সৎ মানুষও চরিত্র হারায়।

ধর্ম যেমন এসেছে মানবতার কল্যাণে, তার কোনো বিনিময় চলে না, তেমনি রাজনীতির উদ্দেশ্যও মানুষের সামষ্টিক কল্যাণ। রাজনীতির নামে কোনো ব্যবসা চলে না, স্বার্থসিদ্ধি চলে না। যদি করা হয় তাহলে ঐ রাজনীতির কারণে তামসিক শক্তি, আসুরিক শয়তানি শক্তির উত্থান ঘটে। ফলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ যাদেরকে স্বাস্থ্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, অর্থ, সামর্থ্য দান করেছেন সে ঐ সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করতে দায়বদ্ধ। এজন্য সে কোনো স্বার্থ নিতে পারবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে এখানে রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি প্রতারণামূলক ব্যবসা যেখানে অন্যান্য ব্যবসার মতোই বিনিয়োগ করা হয় এবং সেই বিনিয়োগের অর্থ লাভে-মূলে তোলার জন্য হেন উপায় নেই যা গ্রহণ করা হয় না। ক্ষমতা ও পদ পাওয়ার জন্য যাবতীয় পন্থা যেমন ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, প্রতিপক্ষকে গুম ও হত্যা পর্যন্ত করা হয়। এখন আদর্শের দ্বন্দ্ব নয়, স্বার্থের দ্বন্দ্বই রাজনীতির দ্বন্দ্ব।

যতদিন রাজনীতি করে মানুষ টাকা উপার্জন করতে পারবে ততদিন রাজনীতি মানুষকে শান্তি দেবে না। কেবল ঐক্যহীন ও সন্ত্রস্ত করে রাখবে। আমরা এমন একটি রাজনীতিক পরিবেশ আশা করি যেখানে ছোট বড় প্রতিটি জননেতা নিজের উপার্জনের টাকায় সংসার চালাবেন, নিজের টাকায় গাড়ির তেল কিনবেন, ফোনের বিল দিবেন, বাসা ভাড়া দিবেন। রাজনীতির বিনিময়ে জনগণ থেকে এক পয়সাও নিবেন না। তারা রাজনীতি করবেন কেবলই মানবতার কল্যাণে। এমন সমাজপতির জন্য জনগণ স্রষ্টার কাছে দোয়া করবে, কখনো বলবে না যে - এত লোক মরে ঐ লোকটা কেন মরে না।

ধর্ম কখনো শিল্পচর্চার পথ রুদ্ধ করে না

শিল্প-সংস্কৃতি যে কোনো সভ্যতার একটি অপরিহার্য অংশ। সংস্কৃতির মধ্যে শিল্প একটি বড় অংশ। নাচ, গান, নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পকলারই পৃথক ক্ষেত্র। আলেম দাবিদার একটি শ্রেণি ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, নাচ-গান-চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ। তাদের এ ধারণা সত্য নয়, আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে নাচ, গান-বাজনা, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য নির্মাণ কিছুই নিষিদ্ধ করেন নি। আল্লাহ কেবল নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীলতা, কারণ অশ্লীলতা থেকে সমাজে অশান্তি বিস্তার লাভ করে থাকে। বর্তমানে আত্মাহীন পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' দাজ্জালের অনুসারী নৈতিকতাহীন কিছু মানুষ যাবতীয় শিল্পকে অশ্লীলতার দ্বারা কলুষিত করছে এবং এই অশ্লীলতাকে সর্বমহলে প্রশংসনীয় ও নান্দনিকতা বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিযুগেই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা হারিয়ে যাওয়ার পর শিল্পাঙ্গনসহ জীবনের সকল অঙ্গনেই বিবিধ প্রকার বিকৃতি প্রবেশ করেছে। অশ্লীলতা ও আল্লাহর অবাধ্যতা ক্ষতিকর বলে আমাদের আলেমগণ চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদিকেই হারাম বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। তাদের এই ফতোয়া মাথা ব্যথার দরুন মাথা কেটে ফেলার মতো। এ কারণে অনেক যুক্তিশীল মানুষ ধর্মের নামে চলা এই কূপমণ্ডূকতাকে মেনে নিতে না পেরে পুরোপুরি ধর্ম বিদ্বেষী হয়ে গেছেন। তারা দেখছেন ধর্মান্ধরা বহু ভাস্কর্য ধ্বংস করছে, সঙ্গীতানুষ্ঠানে বোমা মারছে। এসব দেখে তারা ভাবছেন, ধর্মই কুসংস্কার। তারা এই ধর্মবিদ্বেষ প্রকাশ করছেন ব্লগে, পত্রিকায়, বক্তব্যে, লেখায়, চলচ্চিত্রে। এ থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি আহত হচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্ম গেল ধর্ম গেল শোর তুলে দাঙ্গা সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে।

অথচ ধর্ম কখনো গান, বাদ্য, নৃত্যকে নাজায়েজ করতে পারে না। সনাতন ধর্ম সহ অনেক ধর্মেই এগুলি ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তির মাধ্যম ছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং স্রষ্টাই সুর ও নৃত্য সৃষ্টি করেছেন। শেষ প্রেরিত গ্রন্থ আল কোর'আনকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ছন্দবদ্ধ করে। কেবল কোর'আন নয়, যবুর, গীতা, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থও আল্লাহ পাঠিয়েছেন কাব্যময় কোরে। ভগবদগীতার অর্থই হল ঈশ্বরের গান। আযান ইসলামের এক অনন্য সঙ্গীত। নৃত্য হচ্ছে শৃঙ্খলার অনুপম নিদর্শন। পাখির ঝাঁক যখন আকাশে ওড়ে- তাদের মধ্যে বিরাজ করে অনুপম শৃঙ্খলা। পাখির কণ্ঠে তিনিই সুর ও সঙ্গীত দান করেছেন। সাগরের ঊর্মিমালায়, সবুজ মাঠে ধানের আন্দোলনেও আছে অপরূপ নৃত্যের নিদর্শন। যে স্রষ্টা এত বড় শিল্পী তিনি কী করে মানবজাতির জন্য শিল্পকে হারাম করতে পারেন?

সুতরাং অশ্লীলতা না করে বা কারো সম্মানহানি না করে, স্রষ্টার নাফরমানি না করে যে কোনো শিল্পকর্মই ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল বৈধই নয় আল্লাহর সকল নবী-রসুল, অবতার এমন কি শেষ রসুল মোহাম্মদও (দ.) একে উৎসাহিত

করেছেন। যুদ্ধ, বিয়েসহ যে কোন আনন্দ-উৎসবে মদিনায় নাচ ও গানের অনুষ্ঠান করা হতো, এমন বহু ঘটনা হাদিস ও সীরাতগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিম শিল্পীরা অনেক বাদ্যযন্ত্র ও সুরলহরী উদ্ভাবন ও রচনা করেছেন এ কথা সকলেই অবহিত আছেন।

সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি, তারা সবাই একই পিতা মাতার সন্তান। সুতরাং তারা সকলে ভাই-ভাই। সকল ধর্মও একই স্রষ্টার থেকে আগত। তাই মানবজাতির মধ্যে কোনোপ্রকার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, ভৌগোলিক বিভক্তি স্রষ্টার কাম্য নয়। বরং স্রষ্টা একে লুপ্ত করার জন্যই শেষ রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি চান সমগ্র মানবজাতি এক জাতিতে পরিণত হোক। স্রষ্টার এ অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করে নিজেদের মধ্যে বিরাজিত সকল বিভক্তির প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করে বিশ্বমানবকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করাই এখন সময়ের দাবি, এটাই ধর্মের কাজ, এটাই উপাসনা, এটাই প্রকৃত এবাদত।

আল্লাহর রসুল কি সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্যের প্রতি বিরূপ ছিলেন? এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের ব্যস্ততম মহামানব যাঁর নবী জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে। মদিনা জীবনের প্রতি ৩২ দিনে তাঁকে একটি করে যুদ্ধ সংঘটন করতে হয়েছিল। তাঁর পক্ষে সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি শিল্পচর্চা নিয়ে মেতে থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলে কি তিনি এগুলো নিষিদ্ধ করেছিলেন? কখনোই নয়। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বাদ্য সহযোগে গান শুনেছেন এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ তাঁর পবিত্র জীবনে রয়েছে। আরবের বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে, বিবাহে, যুদ্ধে সর্বত্র গানের চর্চা ছিল। অথচ বর্তমানে কেবল হামদ-নাত জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াকেই আলেমগণ বৈধ বলে মনে করে থাকেন। তাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি বা পহেলা বৈশাখের গান দূরে থাক, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াও কাম্য নয়। অথচ ইমাম গাজ্জালী 'এহইয়াও উলুমদ্দিন' গ্রন্থে লিখেছেন, "কোকিলের সুর শোনা যেমন হারাম নয়, তেমনি মানুষের ইচ্ছা মোতাবেক কণ্ঠ নিঃসৃত সুর শ্রবণ করাও হারাম নয়। মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুর, বিভিন্ন তারযন্ত্রের ওপর আঘাত বা ঘর্ষণজনিত আওয়াজ, দফ, তবলা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজও হারাম নয়"।

সংস্কৃতি এমন একটা শক্তিশালী মাধ্যম যে মাধ্যম দিয়ে আমরা সত্য প্রকাশ করতে পারি। একজন লেখকের কলমের কালি যদি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র হয়, তবে একজন গায়কের গান কেন নয়? যদি সেই শিল্পীর গান মানুষকে মানবতার কল্যাণে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই গানও এবাদত। একই কথা অন্য শিল্প মাধ্যমগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। আল্লাহ যাদেরকে শিল্পপ্রতিভা দান করেছেন তাদেরকে এর হক আদায় করতে হবে। সেটা হলো, তাদের এই গুণকে স্বার্থহাসিলের জন্য ব্যবহার না করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। তবে যে শিল্প, সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজের মধ্যে বিদ্বেষ, অনৈক্য, অসভ্যতা, অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, তা সবই পরিত্যাজ্য। আমরা অন্যায়মুক্ত সুন্দর একটা সংস্কৃতিক

জগত মানবজাতিকে উপহার দিতে চাই। কিন্তু এটা আমাদের একার পক্ষে সম্ভব হবে না, সকলের সহযোগিতা লাগবে।

নারী নিয়ে আধুনিকতা ও ধর্মের টানাপড়েন

নারী পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য ও তাদের দায়িত্বঃ

মানবজাতিকে আল্লাহ সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মূল দায়িত্ব হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। প্রতিটা ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে যা নির্ধারিত হয় তার মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে। মানুষের মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু'টি সৃষ্টি - নারী ও পুরুষ। শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গঠনে এদের উভয়েরই স্রষ্টা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা তাদের গঠন কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিশীল। প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন পরিবারে নারী ও পুরুষ সদস্য থাকে, শিশুর জন্ম হয়, তার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পরিচর্যা, সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। পরিবারের বয়স্ক মানুষদের দেখা-শুনা, অসুস্থদের সেবা-শুশ্রুষা, অতিথিদের আপ্যায়ন ইত্যাদি করতে হয়। সব পরিবারেরই বড় একটি কাজ হলো অর্থের যোগান, সার্বিকভাবে পরিবারকে প্রতিপালন করা। কাজেই পরিবারের কে কোন কাজ করবে তার একটি সাধারণ শৃঙ্খলা অপরিহার্য। একটি শিশুর পক্ষে যেমন শক্ত কাজ করা সম্ভব নয় তেমনি পরিবারের বয়স্কদের পক্ষেও পরিশ্রমের কাজ করা অসম্ভব। পুরুষ যে কাজ অনায়াসেই করতে পারে নারীর পক্ষে তা কষ্টকর। এ কারণে নারী ও পুরুষের গঠন-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে পরিবারে তাদের দায়িত্বের সাধারণ শৃঙ্খলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ।

পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে শারীরিক দিক থেকে নারীর চেয়ে শক্তিশালী, তার পেশী, বাহু, হাড়ের গঠন, মেরুদণ্ড এক কথায় তার দেহকাঠামো নারীর তুলনায় অধিক পরিশ্রমের উপযোগী। প্রকৃতিই তাকে রুক্ষ পরিবেশে কাজ করে উপার্জন করার সামর্থ্য বেশি দান করেছে। তাই পুরুষের দায়িত্ব হলো সে শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করে, কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভূমি কর্ষণ করে ফসল ফলিয়ে, শিল্পকারখানায় কাজ করে উপার্জন করবে এবং পরিবারের ভরণপোষণ করবে। এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুরুষকে আল্লাহ নারীর সুরক্ষা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন, নারীর অভিভাবক করেছেন। এটাই মানব সমাজে, বিশেষ করে পরিবারে পুরুষের বুনিয়াদি দায়িত্ব। অপরদিকে নারীদেরকে আল্লাহ সন্তান ধারণের উপযোগী শরীর দান করেছেন, সন্তানবাৎসল্য ও সেবাপরায়ণতা দান করেছেন। তাই প্রকৃতিগতভাবেই তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানধারণ করা, তাদের লালন-পালন করা, রান্না-বান্না করা এক কথায় গৃহকর্ম করা। প্রয়োজন হলে পরিবারের অর্থ যোগানোর কাজে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে কিন্তু সেটা তাদের

মূল কাজ নয়। তবে মনে রাখতে হবে এটি পারিবারিক শৃঙ্খলা। সমাজ ও জাতি গঠনে পুরুষের পাশাপাশি যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নারীদের সকল কাজে সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকার ও উদাহরণ ইসলামে রয়েছে।

জাতি গঠনে নারীর ভূমিকাঃ

সমাজ, সংসার ও পরিবারকে সুখ-শান্তিতে পূর্ণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে নারীকে। প্রত্যেকটি মানব শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয় হলো তার পরিবার এবং প্রথম শিক্ষক হলো তার মা। মা সন্তানকে যা শিখাবে তাই তার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে। সন্তানের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায় মা, সামনে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রত্যয়ী করে মা। তেমনি স্বামীর জন্য তার স্ত্রী হলো অনুপ্রেরণা, জীবনে চলার পথের বিশ্বস্ত একজন সাথী। অর্থাৎ নারী কখনও মা হয়ে, কখনও বোন হয়ে, কখনও স্ত্রী হয়ে, কখনও কন্যা হয়ে পরিবার ও সমাজের শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করে থাকে। এক কথায়, নারী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, বরকত ও নেয়ামতস্বরূপ।

প্রকৃত ইসলামের নারীঃ

প্রকৃত ইসলামে নারীরা আল্লাহর রসুলের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধাহতদের সেবা করেছে, যুদ্ধের রসদ সরবরাহের কাজ করেছে, পুরুষদেরকে যুদ্ধের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, হাসপাতাল পরিচালনা করেছে এবং স্বয়ং যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। আজ নারী শিক্ষার জন্য মৌলবাদীদের গুলিতে আহত হওয়ায় মালালা ইউসুফ জাইকে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়েছে, পুরো বিশ্ব আজ তাকে চেনে। অথচ ১৪০০ বছর আগে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বর্বরতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য যে সুমাইয়া (রা.) নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁকে কয়জন চেনে? আহত লোকদের সেবা শুশ্রুষার জন্য ফ্লোরেন্স নাইটেংগেল বা মাদার তেরেসার নাম সবাই জানে, অথচ রুফায়দাহ (রা.) যিনি আহত লোকজনের সেবার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিলেন তাঁকে কতজন জানে? মক্কার ধনাঢ্য মহিলা ব্যবসায়ী ছিলেন আম্মা খাদিজা (রা.) যিনি সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করেন সেই ইতিহাস আমরা কয়জন জানি?

আল্লাহর রসুল নারীদের পর্দার দোহাই দিয়ে ঘরের কোনায় বসিয়ে রেখেছিলেন এমন কোনো ইতিহাস কেউ দেখাতে পারবেন না। তারা আল্লাহ রসুলের সাথে একসাথে সালাহ কায়েম করতেন, রসুলের সামনে বসে কথা শুনতেন, জাতীয় বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, এমনকি ব্যক্তিগত সামান্য বিষয়েও রসুলাল্লাহর সাথে আলাপ করতেন। উম্মে আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমাদেরকে রসুলাল্লাহ (দ.) আদেশ করেছেন আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাতে সালাতের জন্য বের করে দেই; পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনীসহ সকলকেই। কিন্তু ঋতুবতী মেয়েরা ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে সালাত

আদায় থেকে বিরত থাকবে তবে কল্যাণ ও মুসলিমদের দোয়ায় অংশ নিবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের মাঝে কারো কারো ওড়না নেই যা পরিধান করে আমরা ঈদের সালাতে যেতে পারি। রসুলাল্লাহ (দ.) বললেন, সে তার অন্য বোন থেকে ওড়না নিয়ে পরিধান করবে। (মুসলিম)

অর্থাৎ সকল নারী বালিকা, তরুণী, বৃদ্ধা, কুমারী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা এমনকি ঋতুবতী হলেও ঈদগাহে যেতে আদেশ করেছেন। এর অর্থ আল্লাহর রসুল নারীদেরকে জাতীয় জীবনের কার্যক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকতে নির্দেশ, প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। অথচ ব্রিটেনে আমেরিকায় নারীরা ভোটাধিকার বা সেনাবাহিনীতে কাজ করার অধিকার পেয়েছে একশ বছরও হয় নি, এজন্য তাদের অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে। অথচ ১৪০০ বছর আগে যে যুগে মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো সেই সময়ে ইসলাম এমন পরিবর্তন এনেছিল যে আম্মা আয়েশা (রা.) উটের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব পর্যন্ত দিয়েছিলেন। মদিনার বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রের দায়িত্বে ছিলেন শেফা (রা.)। এভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ ছিল সমাজের সর্বত্র।

ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি করা নারীঃ

আল্লাহ নারীকে যে কত বড় সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন, নারীকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে সত্যটি না জানার কারণে নারী আজ সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত, অবাঞ্ছিত এবং নির্যাতিত। নারীকে একশ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী ধর্মের দোহাই দিয়ে, পর্দার অজুহাতে, তাদের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার অজুহাতে মিথ্যে ফতোয়ার বেড়াজালে বন্দী করে আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত কিম্ভূতকিমাকার অবলা প্রাণীতে পরিণত করে রেখেছে। তারা মনে করে নারীর পৃথিবী সম্পর্কে জানার দরকার নেই, শিক্ষালাভের প্রয়োজন নেই। নারী নেতৃত্বকে হারাম ফতোয়া দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ বানিয়ে রাখতে চায়।

পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি করা নারীঃ

অন্যদিকে আরেকদল নারী পশ্চিমা ধর্মহীন জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। যাবতীয় ধর্মান্ধতা ও পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তির দিকে তাদেরকে প্রলুব্ধ করছে পশ্চিমা কথিত আধুনিকতা। কিন্তু সেটা কি আসলেই মুক্তি নাকি সোনার শেকল সেটা তারা অনেকেই বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না। নারীর সম-অধিকার ও ক্ষমতায়ন, অবাধ স্বাধীনতার কথা বলে অর্ধনগ্ন করে পুরুষের লালসার বস্তুতে পরিণত করেছে। বাহারী পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীদেহের যথেচ্ছ ব্যবহার পুঁজিপতির ধনলিপ্সা পূরণে ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে কত বড় সম্মান ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেটা উপলব্ধি না করার কারণে তারা নিজেদেরকে অপচয় করে যাচ্ছে। তারা সমাজের শান্তি বিধানে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না বরং তাদেরকে কেন্দ্র করে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন

পর্যন্ত বিষময় হয়ে উঠছে। একদিকে ধর্মব্যবসায়ীদের কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা, স্থবিরতা অন্যদিকে উগ্র পশ্চিমা অশ্লীল সংস্কৃতি নারীর জীবনকে এভাবেই ভারসাম্যহীন করে রেখেছে।

নারীর মর্যাদা কী, অধিকার কী?

আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন অফিস আদালতে নারীরা কাজ করছেন। এমনকি শিল্প কারখানায়, অবকাঠামো নির্মাণকার্যে, রাস্তাঘাটে, ক্ষেতে খামারে তারা পুরুষের মতোই সমান কায়িক পরিশ্রমের কাজ করছেন, ইট পাথর টানছেন, মাটি কাটছেন, কৃষিকাজ করছেন। গার্মেন্ট শিল্পের নারী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা, নিগ্রহের কথা আমরা প্রতিদিনই পত্রিকায় দেখি। কিন্তু তারা নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার সংকট সত্ত্বেও পেটের ভাত জোগাড় করতে এই কাজগুলো করে যেতে বাধ্য।

বর্তমানে জীবিকার জন্য মাটিকাটা, ট্রাক থেকে ইট নামানো-ইট তোলা, কৃষিকাজ, দিনমজুরের কাজ করা, উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রমের কাজ করাকে তার অধিকার বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু এগুলো আসলে নারীর অধিকার নয় বরং অধিকার হারানোর করুণ পরিণতি। আল্লাহ প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে মানবজাতির বিকাশের প্রয়োজনেই নারীকে তিনি সৃষ্টি করলেন এবং নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করলেন মূলত ঐ বংশগতি রক্ষার জন্যই। নারীকে দিলেন করুণা, ভালোবাসা, মমতায় পূর্ণ স্নেহপরায়ণ হৃদয় যেন যে তার সন্তানকে লালন পালন করে বড় করে তোলে। নারী ও পুরুষের মৌলিক কাজকে যদি উপেক্ষা করা হয় তাহলে মানবজাতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, নতুবা মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

সুতরাং নারীর অধিকার হলো সে একটি সংসার লাভ করবে যেখানে তার সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা থাকবে। সে কন্যা হিসাবে বাবা-মায়ের আদর ও স্নেহ লাভ করবে এটা তার অধিকার। সে স্ত্রী হিসাবে ভরণপোষণ, ভালোবাসা ও মর্যাদা লাভ করবে। সে মা হিসাবে সন্তানদেরকে উত্তম সংস্কার দিয়ে গড়ে তুলবে। নারী পরিণত বয়সে সন্তান ও নাতি-নাতনিদের সেবা-যত্নে আর ভালোবাসায় সিক্ত হবেন এটা তার প্রকৃতিদত্ত অধিকার। যেহেতু নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরুষ অপেক্ষা কোমলতর তাই জীবনের প্রতিটি অবস্থানেই তার সুরক্ষার আবশ্যকতা রয়েছে। এজন্য পুরুষকে পারিবারিক জীবনে নারীর রক্ষাকারী ও অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এটি তার সামাজিক নিরাপত্তার জন্যও অপরিহার্য এ কথা আশা করি কোনো সমাজবিজ্ঞানীও অস্বীকার করতে পারবেন না। এইরূপ নিরাপদ ও সুখময় সাংসারিক ও সামাজিক পরিবেশ নারীর প্রথম অধিকার।

আমরা দু'একজন নারীকে নিয়ে বলছি না, বলছি সকল নারীর চিরন্তন (Universal) অবস্থানের কথা। নারী তার এই চিরন্তন অধিকার কখন হারিয়ে ফেলল? মানুষ যখন ইবলিসের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট

করলো, তখন নারী পুরুষ উভয়েই যার যার অবস্থান ও প্রকৃতিদত্ত দায়িত্ব থেকে সরে গেল। বর্তমান সভ্যতায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের যে ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় চলছে তাতে নারী পুরুষ উভয়কেই জীবিকার অন্বেষণে ঝাঁপিয়ে পড়তে হচ্ছে। জীবিকার সংগ্রাম দিন দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে। সেই সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে অথবা অংশগ্রহণ করে নারী তার শারীরিক লাবণ্য, মানসিক সৌরভ, চারিত্রিক মাধুর্য- এক কথায় তার নারীত্ব হারিয়ে ফেলছে। এতে তার দৈহিক গড়ন পুরুষালী হয়ে যচ্ছে, তার কিন্নর কণ্ঠ হয়ে যাচ্ছে কর্কশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন প্রকৃতির সবচেয়ে কোমল, ভঙ্গুর এবং নরম জিনিসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি সত্যের আলো থেকে বিচ্যুত হবার ফলে সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও শিশুরা। লোহাকে আগুনে পুড়িয়েই আকৃতি দিতে হয়, কিন্তু ফুলকে রাখতে হয় ফুলবাগানে কিংবা ফুলদানিতে। সেই ফুলকে যদি কামারশালায় নিয়ে তপ্ত আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পেটা করা হয় তার পরিণতি কী হবে? আজ নারীকে তাই করা হয়েছে। এতে তার মর্যাদা বাড়ে নি বরং সে নিজের সমস্ত অধিকার হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। কীভাবে?

পশ্চিমা সংস্কৃতির ক্রমাগত 'আঘাতে' একটি কিশোরী তার বাবা-মাকে অবজ্ঞা করতে শিখছে, বাবা-মাও নিজেদেরকে অসহায় মনে করছেন তথাকথিত আধুনিকার সামনে। মেয়েদের স্বাধীনচেতা ধ্যান-ধারণা অথবা স্বামীর দায়িত্বহীনতার কারণে সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, সে স্বামীর স্নেহ ও সুরক্ষা হারাচ্ছে। যদি সংসার থাকেও সেখানে শান্তি থাকছে না। আকাশ সংস্কৃতি প্রতিটি মানুষকে ত্যাগী হওয়ার বিপরীতে ভোগবাদী, শালীনতার বিপরীতে অশ্লীলতার পুজারী ও সম্প্রীতিসূচক মনোভাবের পরিবর্তে কলহপ্রিয়, মিতভাষীর পরিবর্তে বাকচতুর, ধৈর্য-সবরের পরিবর্তে অসহিষ্ণু ও অস্থির করে তুলছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং বাবা-মায়ের ব্যস্ততার কারণে সন্তানের শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেছে টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল। প্রাকৃতিক প্রতিশোধ হিসাবে বার্ধক্যে ঐ সন্তানেরা তার মাকে যত্ন করছে না। তার কাছে স্ত্রী বা প্রেমিকাই অধিক গুরুত্ব আদায় করে নিচ্ছে। এভাবে সে নারী একে একে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি পর্যায় থেকে অধিকার-বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ এই পারিবারিক স্নেহের বন্ধন ছিল তার মৌলিক অধিকার।

তবে মানুষের পরিবার থাকুক আর না থাকুক প্রাণধারণ করতে হলে খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি তার লাগবেই। তাই নারীও বাধ্য হয়ে সেই কষ্টকর পরিশ্রমগুলির দিকে পা বাড়ায়। যারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত তারা হয়তো একটু ভদ্রস্থ পরিবেশে কাজের সুযোগ পান। আর যারা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারেন নি তাদেরকে দিনমজুর পর্যন্ত হতে হয়। কোটি কোটি নারীর মধ্যে কয়েকজন নারী সেনাবাহিনীর অফিসার, বিচারপতি, পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসক হতে পারা অর্থাৎ দু'চারজন ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ পদে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, সমগ্র নারীই অধিকার পেল। এখনো

সামগ্রিকভাবে নারীসমাজ বঞ্চিত, নিগৃহীত, অধিকারহারা। ইসলাম কিন্তু বৈধ কোনো কাজের ক্ষেত্রেই নারীর উপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করে নি। উপার্জনের যে কাজ পুরুষের জন্য বৈধ সেই কাজ নারীর জন্যও বৈধ।

হেযবুত তওহীদের নারীরাঃ

হেযবুত তওহীদের নারীরা এই দুই ধরনের অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা শালীনতা সহকারে পুরুষের পাশাপাশি সব কাজে অংশগ্রহণ করে। শহরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তারা তওহীদের বালাগ দিয়েছেন। তারা পত্রিকা বিক্রি করছে, সেমিনার করছে, আলোচনা সভা ও বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করছে, সাংবাদিকতা করছে, অফিসে কাজ করছে, চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে, শিক্ষকতা করছে, গার্মেন্টে চাকুরি করছে, অনেকে ঘরে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে তা বিক্রি করছে, হকারি করছে। যে কোনো কাজেই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে। সত্যপ্রচারের কারণে তারাও অনেক জেল জুলুমের শিকার হয়েছে, ধর্মব্যবসায়ীদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছে নিজের ঘরবাড়ি ও সংসার থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, অনেকে স্বামী, সন্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন যেটা অনেক নারী সাহাবীদের বেলায়ও হয়েছিল। তারা মহামান্য এমামুয্যামানের আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছে, একসাথে সালাহ কায়েম করেছে, আলোচনা সভায় পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছে। নিজেদের পার্থিব সম্পদ বিসর্জন দিয়ে মানবজাতিকে চলমান অন্যায় অশান্তি থেকে মুক্তি দেবার জন্য হেযবুত তওহীদের নারীরা পুরুষের সাথে সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯ নভেম্বর ২০১৫ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত 'সন্ত্রাস দমনে জনসম্পৃক্ততার বিকল্প নেই' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে গণমাধ্যমকর্মী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন লেখক হেযবুত তাওহীদের মাননীয় এমাম হোসাইন মোহম্মদ সেলিম (বামে)।

প্রচলিত বিকৃত ইসলাম আর প্রকৃত ইসলামের উদ্দেশ্যের তফাৎ

একদিন মানবজীবনের জন্য স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান বহনকারী শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ.) কা'বা শরীফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তখন সময়টা ছিল এমন যখন তিনি ও তাঁর সহচরগণের ওপর প্রচণ্ড বাধা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চলছিল। হঠাৎ একজন সহচর (সাহাবা) বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই অত্যাচার নিপীড়ন আর সহ্য হচ্ছে না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের বিরোধীরা সব যেন ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটাকে আল্লাহর রসুল কতখানি গুরুত্ব দিলেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং ঐ সাহাবাকে বললেন, তুমি কী বললে? সাহাবা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। শুনে আল্লাহর রসুল তাকে বললেন, 'শোন, শীঘ্রই সময় আসছে যখন কোনো যুবতী মেয়ে গায়ে গহনা পরে একা সা'না থেকে হাদরামাউত যাবে (প্রায় ৩০০ মাইল পথ)। তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না (হাদিস: খাব্বাব (রা.) থেকে বোখারী ও মেশকাত)।'

এই ঘটনাটির মধ্যে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে।

১. আল্লাহর রসুল উদাহরণস্বরূপ বললেন, স্ত্রী লোক, কোন পুরুষের কথা বললেন না। কারণ স্ত্রী লোকের প্রাণ ও সম্পদ ছাড়াও আরও একটি জিনিস হারাবার সম্ভাবনা আছে যা পুরুষের নেই। সেটা হল ইয্যত, সতীত্ব, মান-সম্ভ্রম।

২. ঐ স্ত্রী লোক বয়সে যুবতী। অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি।

৩. অলঙ্কার গহনা পরিহিত, চোর ডাকাতের জন্য লোভনীয়।

এতগুলো লোভনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রসুল বলছেন, অনুরূপ একটি অলঙ্কার পরিহিত যুবতী স্ত্রীলোক একা সা'না শহর থেকে প্রায় তিনশ' মাইল দূরবর্তী হাদরামাউতে যেতে, যা সে সময়ে অন্তত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এত দীর্ঘ পথে আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া কন ভয় করবে না।

৪. লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রীলোকটি শুধু পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হবে না, আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কোনো রকম বিপদের কোনো আশঙ্কাই তার থাকবে না। চিন্তা করে দেখুন, একটি সমাজের নিরাপত্তা কোন পর্যায়ে গেলে অনুরূপ অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মনে আল্লাহ এবং বন্য পশু ছাড়া আর কোনো ভয়ই থাকে না।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই জীবনব্যবস্থার (দীন) প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বর্তমান ধর্মের উদ্দেশ্যের (আকিদা) বিরাট তফাৎও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রকৃত ইসলামের, জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানবজীবনের নিরাপত্তা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর বর্তমানের ইসলামের উদ্দেশ্য ওসব কিছুই নয় বরং সময়মতো নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, লম্বা পোশাক ও খাঁটো পায়জামা পরা ইত্যাদি। বর্তমানের এই আকিদাই যদি সঠিক হতো তবে আল্লাহর রসুল তাঁর সাহাবার কথার উত্তরে শীঘ্রই সেই অভূতপূর্ব নিরাপত্তা আসছে এ কথা না বলে বলতেন, অতি শীঘ্রই সময় আসছে যখন মানুষ দলে দলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবে, হজ্জ করবে, রোজা রাখবে, লম্বা লম্বা দাড়ি রাখবে, যেকের করবে, লম্বা জোব্বা আর খাঁটো পায়জামা পরবে।

স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে বর্তমানে মানবজাতি যে বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা নিজেরা চিন্তাভাবনা করে তৈরি করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তা তাদের জীবনে কার্যকরী করছে তার ফল আমরা কী দেখছি?

প্রথমটাই ধরা যাক, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। এর অবস্থা যতই দিন যাচ্ছে সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ধনী উন্নত বিশ্ব তাদের যার যার দেশে খুন, জখম, রাহাজানি, অপহরণ, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি সমস্ত অপরাধ দমন, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ, ফরেনসিক সাইন্স ইত্যাদির উন্নয়ন ও অপরাধ দমনের প্রযুক্তি উ দ্ভাবনের জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এই সব উন্নত দেশে প্রতি ঘণ্টায় বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারগুলির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ জগতের অপরাধীরাও সমান পাল্লা দিয়ে চলছে।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারও তাদের দারিদ্র্য ও অনুন্নত প্রযুক্তি নিয়ে অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করতে পারছেন না। এ দেশগুলিতেও অপরাধের মাত্রা উন্নত দেশগুলির মতই ধাঁ-ধাঁ করে বেড়ে চলছে।

প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফল কী ছিল

শেষ রসুলের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা মানবজাতির একটি অংশে প্রয়োগ ও কার্যকরী করার ফল কী হয়েছিল তা একবার দেখা যাক। যারা এই লেখা পড়ছেন, তাদের অনুরোধ করছি আপনারা মনে মনে কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সমাজ কল্পনা করুন। কল্পনা করুন এই সমাজে অস্ত্র কিনতে বা তৈরি করতে কোনো বাধা নেই, কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন পড়ে না, যে কেউ অস্ত্র কিনে বা তৈরি করে তার ঘর ভরে ফেললেও কেউ তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না।

কল্পনা করুন, এই সমাজে কোন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী নেই। বর্তমানের মত হাজার হাজার লোক রাখার উপযোগী কোন জেলখানাও সেখানে নেই। শুধু বড় বড় শহরগুলিতে দুই চারজন লোক রাখার মত ছোট জেলখানা আছে। কিন্তু সমাজে বলতে গেলে কোনো অপরাধ নেই। বিচারালয়গুলিতে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা প্রায় অনুপস্থিত। আমরা জানি এমন একটি সমাজ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমাদের আরজ হচ্ছে, আপনারা যা কল্পনা করতে পারছেন না, তা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের জাতি গঠন থেকে শুরু করে এই জাতির আদর্শচ্যুতি ও ফলে পতন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত বহু বছর ধরে এই অবস্থা বিরাজ করেছিল। অস্ত্রের মালিকানা, অস্ত্র তৈরি ও বিক্রয়ের উপর সামান্যতম কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও, দেশে কোন পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। একজন যুবতী মেয়ে রাতের অন্ধকারে স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে যেত, আল্লাহ ও বন্য জন্তুর ভয় ছাড়া আর কোনো ভয় তার মনে জাগ্রত হতো না। আদালতে মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আসত না। এই অকল্পনীয় অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? এর একমাত্র কারণ, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত একটি সত্য জীবনব্যবস্থা সেখানে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিল। সেই জীবনব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি অঙ্গনকে সত্যে ও ন্যায়ে পূর্ণ করে দিয়েছিল আর সত্য ও ন্যায়ের একমাত্র ফল হচ্ছে অনাবিল শান্তি। তাদের জাতিগত মূলমন্ত্র ছিল একটাই, স্রষ্টার হুকুমের বাইরে আর কোনো হুকুম আমরা মানি না এবং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে গোটা জনগোষ্ঠী ছিল ঐক্যবদ্ধ। আর এটাই হচ্ছে হেযবুত তওহীদের আহ্বান।

হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের অপপ্রচার

যে মিডিয়াগুলো আমাদের এই আহ্বানের বিরুদ্ধে তারাই এই আহ্বানকে স্তব্ধ করার জন্য অপপ্রচারের পথ বেছে নিয়েছে। তারা মিথ্যা প্রচার করে আমাদের সম্বন্ধে সরকারের কাছে, পুলিশের কাছে, জনগণের কাছে ধারণা দিচ্ছে যে এরা জঙ্গি, এরা সন্ত্রাসী, এরা খ্রিষ্টান ইত্যাদি। আমরা যখন প্রতিবাদ করেছি যে আপনারা ভুল লিখছেন, মিথ্যা বলছেন তখন সেটা তারা ছাপাচ্ছেন না, কারণ তারা চান না যে মানুষ হেযবুত তওহীদকে ভালো মনে করুক। এই হচ্ছে অবস্থা। যদি তাদের সত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহলে বলব, আপনারা আমাদের সম্বন্ধে সত্য জানতে চাইলে আমাদের কাছে আসুন, আমাদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন, জিজ্ঞেস করুন, জানুন। তারপরে যদি আমাদের কোনো দোষ দেখতে পান তাহলে সেটা জাতির সামনে তুলে ধরুন।

গণমাধ্যমের প্রতি সুস্পষ্ট কথা হলো, তাদের অনেকে আল্লাহর বিধান চান না, আর আমরা আল্লাহর বিধান চাই। এই তো কথা? সেক্ষেত্রে তারা এই না চাওয়ার পেছনে কী কী যুক্তি আছে সেগুলো কাগজে লিখুন। আমরা চাচ্ছি আল্লাহর বিধান - আমরা চাই যে তাঁর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হোক যার ফল হবে শান্তি। আর তাদের কথা হচ্ছে যে, না, শান্তি আসবে গণতন্ত্র, সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে, তারা হয়তো অনেকে স্রষ্টাকেই বিশ্বাস করেন না। ঠিক আছে অসুবিধা নেই। এখন তারা তাদের যুক্তিগুলো পত্রিকায় পেশ করুন, পাশাপাশি আমাদের কিছু বক্তব্য থাকলে সেটাও তারা তুলে ধরুন। দু পক্ষের বক্তব্যই মানুষের সামনে উপস্থাপিত হোক। মানুষ বুঝুক যে কার যুক্তিটা ঠিক আছে। তাদের যুক্তিতে যদি মানুষ সম্মত হয় যে, আল্লাহ নেই অথবা যদি মনে করে যে আল্লাহর বিধান এ যুগে শান্তি দিতে পারবে না, সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-রাজতন্ত্র-ফ্যাসিজম কোনটা প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত সেই বিচার মানুষই করুক, আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। আমরা ভেবে নেব যে আমাদের যুক্তি গৃহীত হয় নি, তাদেরটা হয়েছে।

কিন্তু এইখানে তারা আমাদের বক্তব্য কিচ্ছু না বলে আমাদের সম্বন্ধে অবিশ্রান্তভাবে মিথ্যা লিখবেন, আমরা প্রতিবাদ করলে ছাপবেন না পর্যন্ত এটা কোন নীতি (ethics)? এমন কোনো নীতি আছে দুনিয়ায়? নেই। আমরা যা বলি না সেটা আমাদের নামে চালিয়ে দিবেন - এটা কি ঠিক? গত ২০ বছর আমাদের সম্বন্ধে হাজারো ডাহা মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে। আমরা সেগুলোর প্রতিবাদ করেছি কেউ ছাপে নি, অথচ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টে পরিষ্কার বলা আছে যে প্রতিবাদ করলে ছাপতে হবে। শেষে বাধ্য হয়ে বহু টাকা খরচ করে একটা বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রতিবাদও দিয়েছি একটা জাতীয় পত্রিকায় টাকার বিনিময়ে প্রতিবাদ ছাপাতে হলো। এটা কি সাংবাদিকতা? আমাদের কথা হলো, তারা ইসলাম চান না সেটা সাফ সাফ লিখেন, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা কেন লিখবেন? এখানে আমাদের আপত্তি।

গণমাধ্যমগুলো আমাদের বিষয়ে তারা তিলকে তাল করেছে তাই না, তিলও নেই সেটাকেও তাল বানিয়েছে। অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাওয়া আমাদের এমামুয্যামানের নিষেধ। অথচ হাজার বার লেখা হয়েছে যে হেযবুত তওহীদ কোন নদীর চরে, পাহাড়ে, জঙ্গলে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়। প্রতিটা কাগজে বার বার লিখেছে যে হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ সংগঠন। নিষিদ্ধ লিখতে লিখতে এমন করেছেন যাদের জানার কথা কে নিষিদ্ধ কে বৈধ অর্থাৎ পুলিশ, তারাও আদালতে এজাহারে লিখতে শুরু করেছিল 'নিষিদ্ধ ঘোষিত হেযবুত তওহীদ'। চিন্তা করে দেখুন একশ্রেণির মিথ্যাশ্রয়ী গণমাধ্যম বিষয়টা কোথায় নিয়ে গেছেন? পরে সেই পুলিশই আবার তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে যে না, নিষিদ্ধ নয়। এই অন্যায় গণমাধ্যমগুলো করেছে, একটি মিথ্যা লিখতে লিখতে পুলিশের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে হেযবুত তওহীদ জঙ্গি, নিষিদ্ধ।

অবশ্য অত্যন্ত আশার কথা এই যে, গণমাধ্যমেও কিছু সত্যনিষ্ঠ মানুষ রয়েছেন যাদের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তারা ইতোমধ্যে আমাদের সম্পর্কে জেনে পূর্ববর্তী ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তারা সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা গৃহীত হলো, প্রাচ্যে কেন হচ্ছে না?

সব মতবাদের মতো গণতন্ত্রেরও জোয়ার-ভাটা আছে। কখনো দুনিয়াজুড়ে এর ঢেউ আছড়ে পড়ে, আবার সেই পর্ব শেষ হলে গণতন্ত্রে আসে ভাটার টান। আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন তার 'দ্য থার্ড ওয়েভ: ডেমোক্রেটাইজেশন ইন দ্য লেট টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' বইয়ে আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের তিনটি জোয়ারের সময়ের কথা বলেছেন। এই জোয়ারগুলোর মাঝে ভাটার পর্ব গেছে। বাংলাদেশও গণতন্ত্রের এসব জোয়ার-ভাটার বাইরে নয়।

তিনি লিখেছেন, আধুনিক গণতন্ত্রের যে যাত্রা, তা তিনটি পর্ব বা ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। গণতন্ত্রের প্রথম ঢেউটি ছিল ১৮২৮ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত। প্রায় ১০০ বছরের দীর্ঘ এই জোয়ারের সময় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ বিশ্বের ২৯টি দেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ২০ বছর ভাটার সময় গেছে গণতন্ত্রে। তখন কোথাও ফ্যাসিজমের বিকাশ হয়েছে, কোথাও কোথাও কমিউনিজম। গণতন্ত্রের দ্বিতীয় জোয়ার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যৌথ বাহিনীর বিজয়ের পর। বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব গণতন্ত্রে আবার চলে ভাটার টান। সাবেক ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জোরদার হয়ে ওঠে কর্তৃত্ববাদী শাসন। গণতন্ত্রের শেষ জোয়ারটি বয়ে গেছে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত, এ সময়ে দক্ষিণ ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। ১৯৯৪ সাল নাগাদ বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২। এরপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র অবলম্বনকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়ে ১২৫ এ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে সংখ্যার নয় মানের। অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থা বা মতবাদের মতোই গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সরকারগুলো কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছে যা গণতন্ত্রের তত্ত্বের পরিপন্থী।

সমাজের সবকিছুর ওপর সরকারগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ কঠোর থেকে কঠোরতর করে যাচ্ছে। ফলে গণতন্ত্রের নামে বিশ্বময় শুরু হয়েছে জবরদস্তিমূলক শাসন যা কমিউনিজমের নামে জনতার উপর ফ্যাসিজমের স্টীম রোলার চালানোর স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখন গণতন্ত্র যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই গণঅভ্যুত্থান

হবে। যার উদাহরণ হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে সরাতে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে থাই জনগণের রাস্তায় নেমে আসা।

মিসরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে বৈধভাবে নির্বাচিত সরকার উৎখাত হয়েছে পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানে এবং সেখানকার জনগণের একটি বড় অংশ তাকে সমর্থন জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্ব যে গণতন্ত্রের অবতার এমন ধারণা মায়ানমারে সামরিক শাসন উৎখাতের ঘটনা দেখে অনেকে মনে করতে পারেন, কিন্তু তাদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে মিসরের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন কায়েমের পক্ষে পশ্চিমাদের জোরালো অবস্থান গ্রহণের ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করলে। স্যামুয়েল হান্টিংটন এ ধরনের প্রবণতা সম্পর্কে বলেছেন, 'নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে কখনো 'ওপর' থেকে চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অভিজাতদের চাপেই এমনটা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, অনেক দেশই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধারণ করতে প্রস্তুত নয়।'

প্রাচ্যের মানুষও তেমনি প্রস্তুত নয় সেটা গ্রহণ করতে যদিও সরকারগুলো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন এই প্রস্তুত না থাকার কারণটা হৃদয় দিয়ে বোঝা নীতি নির্ধারকদের জন্য খুবই জরুরি। অন্যথায় আমরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র নামক মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে আরো অনেক সময় নষ্ট করে ফেলব। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অত সময় নেই আমাদের হাতে। এই কারণগুলো নিয়ে কয়েকটি সূত্রকথা আমরা এখন আলোচনা করব।

১. ব্যবস্থাটি মানুষের হৃদয়ের অনুকূল ও যুগের দাবি হতে হবেঃ

সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতা সম্পর্কে একটি সরল সূত্র আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তিটি স্থাপন করতে হয় মানুষের হৃদয়ে। মানুষ যদি কোনো জীবনব্যবস্থাকে, সংস্কৃতিকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে নেয় তাহলে সেটি তাদের স্বতঃস্ফূর্ত চর্চার মাধ্যমে এক সময় সভ্যতার রূপ নেয়। যদি কোনো সভ্যতাকে 'ওপর' থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা ক্ষমতা ও বলপূর্বক শাসন করতে পারে তবে সেটা স্থায়ী হয় না, সভ্যতায় রূপ নিতে পারে না। কিছুদিন পরেই তা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ধর্মগুলো হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের হৃদয়ে আসন গেঁড়ে আছে, সেগুলো সভ্যতার রূপ নিয়েছে। তাই একমাত্র পাশ্চাত্য ধর্মহীন সভ্যতাটি ছাড়া অতীতের সবগুলো সভ্যতাই ধর্মভিত্তিক সভ্যতা। তবে ধর্মও যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটা গৃহীত হয় না, যার উদাহরণ বাদশাহ আকবরের দীনে এলাহী ও আফগানিস্তানের তালেবান ইত্যাদি।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসে শাসনক্ষমতা দখল করে এবং তাদের নিজেদের দেশে যা চালিয়ে অভ্যস্ত সেই ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন) রাষ্ট্রব্যবস্থা এখানেও প্রচলন করে। অর্থাৎ তারা ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সভ্যতার উপরে আরেকটি

অসামঞ্জস্যশীল সভ্যতার মূল্যবোধ ও বিধিবিধান চাপিয়ে দেয়। পূর্বতন সভ্যতাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন ও জীবনব্যবস্থার ভিত্তিতে, অর্থাৎ এর ভিত্তি ছিল মানুষের মর্মমূলে যেখানে তাদের ধর্মবিশ্বাস সেখানে। কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষ কি সেই ধর্মভিত্তিক (যদিও তা ত্রুটিহীন ছিল না) ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ত্রাহিসুরে চিৎকার করছিল? তারা কি খারাপ ছিল খুব? না। তারা সেই বিধানের মধ্যে বেশ ভালোই ছিল। টাকায় আট মণ চাল, গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু এই কথাগুলো সেই সোনালি অতীতের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল। অন্তত এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি যে মানুষ তার রাষ্ট্রীয় জীবনে, সামগ্রিক জীবনে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাবে।

২. ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ছিল যুগের দাবিঃ

ইউরোপ কেন ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) জীবনবিধানের দিকে ঝুঁকলো তা প্রাসঙ্গিক কারণে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এটা ছিল দীর্ঘ ১,৫০০ বছরে সৃষ্ট প্রেক্ষাপট ও অজস্র মর্মবিদারী ঘটনাপ্রবাহের ফল। খ্রিষ্টধর্মে জাতীয় জীবনব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও গীর্জার বানোয়াট ধর্মকে জাতীয় জীবনে চালাতে গিয়ে মধ্যযুগে চরম মানবিক বিপর্যয়, সহিংসতা, অরাজকতা, বর্বরতা ও জাহেলিয়াতে ঢেকে যায় ইউরোপ তথা খ্রিষ্টান জগৎ। জনগণের আত্মা রাজা ও গীর্জার পেষণে পড়ে মুক্তির জন্য ত্রাহি চিৎকার করতে থাকে। এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রাজাকে গীর্জার উপরে ক্ষমতাবান করে ১৫৩৭ সনে নতুন একটি ব্যবস্থার পত্তন ঘটানো হয় ব্রিটেনে। এখানে রাজা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের কর্তৃত্ব ও বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যান। ধর্ম নির্বাসিত হয় হিতোপদেশ, পরকাল, প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থাটির আবির্ভাব ইউরোপে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয় বরং তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন ছিল যা তাদের হিসাবে 'ইউরোপের আধুনিক যুগের' সূচনা করেছিল। কোনো ধর্মভিত্তিক জীবনব্যবস্থা না থাকায় তাদের সামনে এ ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে তা ছিল 'ওপর' থেকে চাপিয়ে দেওয়া, নিজেদের জীবনব্যবস্থার সংকটের দরুন নয়।

৩. ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম নির্মূলের চেষ্টা নয়, রাজনীতিক অপব্যবহার করা হয়েছেঃ

ধর্মকে ব্রিটিশরাজ কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে একেবারে নির্মূল করতে চায় নি, তারা কেবল ধর্মকে তাদের শাসননীতির হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। তারা মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে চরম মূর্খতা ও অন্ধত্বের মধ্যে নিপতিত করে রাখতে চেয়েছিল এবং হিন্দুদেরকে পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে নিজেদের অনুগত কেরানি, আর্দালি, দফতরি তথা চাকরিজীবী চাকরে পরিণত করতে চেয়েছিল। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নানা ফন্দিতে পূর্বতন শাসক মুসলিমদেরকে হিন্দুদের (সনাতন) থেকে একশত বছর পিছিয়ে দেয়। ১৮১৭ সনে হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার

জন্য হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠা করা হয়, ১৮২৪ সনে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় কিন্তু সেগুলোতে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বহু রক্তের বিনিময়ে, বহু সংগ্রামের পরে ব্রিটিশ যুগে মুসলিমরা নিজেদের শিক্ষালাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সিপাহী বিদ্রোহেরও ১৮ বছর পর ১৮৭৫ সনে মুসলিমদের জন্য প্রথম কলেজটি স্থাপিত হয় উত্তর প্রদেশের আলীগড়ে। কলকাতায় নারীদের জন্য প্রথম শিক্ষালয়টি নির্মিত হয় ১৮৫০ সনে বেথুন স্কুল কিন্তু সেখানে মুসলিম নারীদের শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল অপ্রতুল। এর ৮৯ বছর পর দেশবিভাগের কিছুদিন আগে ১৯৩৯ সনে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে মুসলিম নারীরা শিক্ষালাভের মোটামুটি সুযোগ লাভ করেন। ধর্মান্ধতার দরুন হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকায় উপমহাদেশের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল দারুণভাবে।

৪. খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতা বনাম সনাতন - ইসলাম ধর্মের সফলতার ইতিহাসঃ

যাদের অতীত আছে তাদের ভবিষ্যৎও আছে। খ্রিষ্টানদের অতীত বলে কিছু ছিল না কারণ ঈসা (আ.) এর দ্বারা কোনো স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ইহুদি ধর্মব্যবসায়ীদের প্রবল বাধার কারণে তাঁর শিক্ষা বিকশিত হতে পারে নি, ফলে তাঁর মিশন অসমাপ্ত থেকে যায়। তিনি তিনবছর তওহীদ প্রচারের পর আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁর অনুসারীরাও ব্যর্থ হন, স্বভাবতই। সুতরাং খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো অতীত গৌরব নেই, তাই তারা সহজেই জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পেরেছে। ধর্মের সংস্কার করে, জাতির মধ্যে পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করে ধর্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোনো প্রয়াস তারা করতে পারে নি, কেননা অতীত থেকে কোনো উদাহরণ তাদেরকে সেই প্রেরণা যোগায় নি। তবে ভবিষ্যতে ঈসা (আ.) দ্বিতীয়বার এসে বিশ্বময় শান্তি (The Kingdom of Heaven) প্রতিষ্ঠা করবেন এমন বিশ্বাস খ্রিষ্টানরা যেমন পোষণ করে, মুসলিমরাও পোষণ করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও বিশ্বাস করে যে আবার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, রামরাজত্বের শান্তি আবার ফিরে আসবে এবং তারাই বিশ্বের উপরে কর্তৃত্বশীল হবে। কিন্তু বিশ্বাস করলে কী হবে, ভবিষ্যতের একটি বিষয়কে নিয়ে যত রাজনীতিই করা হোক, যত ক্রুসেডই বাঁধানো হোক, সেটার ভিত্তিতে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুসলিমদের একটি মহান সুখকর স্বর্ণোজ্জ্বল, শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ অতীতকাল আছে। জীবনের প্রতিটি শাখায় তারাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছিল এ কথা মুসলিমরা ভুলবে কী করে? তাই তাদের ধর্মবিশ্বাস যতদিন থাকবে, আবার সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার জন্য আকুলতা তাদের কিছু অংশের মধ্যে হলেও ক্রিয়াশীল থাকবে। তারা বিদ্রোহ করবেই। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থেও আছে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগে শাস্ত্রের শাসনে সৃষ্টি হওয়া সুবিচার, নিরাপত্তা, প্রাচুর্য আর শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। কিন্তু সেটা ছিল সুদূর অতীত, আর মুসলিমদের স্বর্ণময় ইতিহাসটা তখনও তরতাজা, হারানোর শোকটাও অমলিন।

৫. ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি প্রযুক্ত ধর্মান্ধতা, সংশয়বাদ ও সাম্প্রদায়িকতার আবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চার প্রতিবন্ধকঃ

ব্রিটিশরা মুসলিমদের এই চেতনাটিকে মেরে ফেলার জন্যই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিল। মাদ্রাসার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। পাশাপাশি সনাতন ধর্মীদের মধ্যেও বিস্তার ঘটিয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব। ১২০০ বছর ধরে (মুহাম্মদ বিন কাশেম থেকে টিপু সুলতান পর্যন্ত) ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান ছিল শান্তিপূর্ণ, কিন্তু ব্রিটিশদের কূটনীতির কারণে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতার শকুন যা ধর্মীয় দাঙ্গা বাঁধিয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলিমের শব ভক্ষণ করেছে।

ব্রিটিশ আসার আগে ভারতে সাম্প্রদায়িক কোনো দাঙ্গা হয় নি এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। এমনকি ব্রিটিশের আগে ভারতবর্ষ 'হিন্দু-মুসলিমের' এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল না। ইউরোপে যখন জাতিরাষ্ট্রের ধারণা বিকাশমান, তখন ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তন করে। ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বৈরী সত্তায় বিভাজিত, এটা উপনিবেশবাদী ইংরেজের প্রচারিত মত।

ব্রিটিশরা সেই সূত্র ধরে শেষ দাবার চালটা দিয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ ঘটিয়ে। সেই কুফল আজও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। যতই ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করা হোক, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা মোটেও বিদূরিত হয় নি, কেবল আত্মকেন্দ্রিকতার দরুন তা কিছুদিন চাপা পড়ে থাকে, আবার স্বার্থবাজ রাজনীতিবিদরা ভোটের জন্য সেই নিভু নিভু আগুনকে উস্কে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও প্রতিপালন করে যে বিষবৃক্ষটি ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের মাটিতে বড় করে রেখে গেছে, সেই বৃক্ষ থেকে পরধর্মসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা আশা করা কেবল ব্রিটিশদের যারা পদলেহনকারী চাটুকার তাদের পক্ষেই সম্ভব। যারা নিজেদের স্বাধীনতার ইতিহাস ভুলে যায়, আজীবন দাস থাকা তাদের পক্ষেই সম্ভব।

যেটা বলছিলাম, ব্রিটিশরা কিন্তু ভারতবাসীকে ধর্ম ভোলাতে চায় নি, কারণ চাইলেও সেটা পারত না। কারণ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরাই প্রাচ্যের সমাজের নাম রেখেছে বিশ্বাসভিত্তিক সমাজ (Faith-based society)। এখানে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মূল এত গভীরে প্রোথিত যে এর মূলোৎপাটন করা অসম্ভব। কাজেই ধুরন্ধর ব্রিটিশরা চেয়েছে দুটি বিপরীতমুখী শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা জাতিকে দ্বিধাগ্রস্ত, বিভক্ত করে ফেলতে। তারা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ও মুসলিম বিভাজন সৃষ্টি করে গেছে। ধর্মের নামে অধর্মের শেকড় এ জাতির চেতনার গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছে। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম হয়েছে সেখানেও ধর্মীয় মৌলবাদ ও চেতনাকে অবলম্বন করেছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়। এখন গণতন্ত্রের যিকির যতই করা হোক লাভ নেই। ১২৮ বছরের ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস তাই ব্যর্থ হয়ে ধর্মভিত্তিক বিজেপি এখন ভারতের ক্ষমতায়। ফলে হিন্দু মৌলবাদী

দলগুলো হিন্দুত্ববাদের জাগরণের চেষ্টা করছে, যার মূল সুরই হচ্ছে মুসলিমবিদ্বেষ। সনাতন ধর্মেরও আছে সোনালি অতীত, সত্যযুগের ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। অবশ্য সব ধর্মের মতো সেখানেও কুসংস্কারের দূষণ আছে, তথাপি তারা ইউরোপের মতো দেউলিয়া না। তাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে যাতে জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য দিক-নির্দেশনা, বিধি বিধান আছে। তাই সনাতনধর্মীরাও দৃঢ় প্রত্যয়ী হচ্ছেন যে অন্তত জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির জন্য তাদের পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। চূড়ান্ত বিচারে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কেবল বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের কাছে কাম্য হতে পারে কেননা তাদের উভয়েরই ধর্মের সামষ্টিক জীবনবিধান নেই, আছে কেবল আত্মিক উন্নতির দিক-নির্দেশনা। তথাপি তারা রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে এখনো ধর্মকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। উদাহরণ রোহিঙ্গা নির্যাতন ও প্যারিস হামলা। সম্প্রতি প্যারিসে আই.এস-হামলার পর ব্রিটেনে মুসলিম বিদ্বেষ শতকরা ৩০০% বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পত্রিকায় এসেছে। এই বিদ্বেষকেই আরো বৃদ্ধি করে ডানপন্থী দলগুলো জনপ্রিয়তার পারদ ঊর্ধ্বে তোলার চেষ্টা করেছে। পাঠক নিশ্চয়ই জানবেন যে ইউরোপে ডানপন্থী দল বলতে ধর্মহীন বামপন্থীদের বিপরীতে খ্রিষ্ট ধর্মানুভূতিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা রাজনীতিক দলগুলোকে বোঝানো হয়। শরণার্থী মুসলিমদেরকে দেশে ঢুকতে না দেওয়া, সন্ত্রাসী সন্দেহে অভিবাসী মুসলিমদের জীবনকে সমস্যা-সংকুল করে তোলাই তাদের এখনকার রাজনীতিক কর্মসূচি। বাইবেলে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, হাজার বছরের শিরোভাগে ঈসার (আ.) পুনরাগমন হবে এবং তিনি ইবলিসকে বেঁধে রেখে এক হাজার বছর শান্তিতে দুনিয়া শাসন করবেন (রিভিলেশান ২০:১-৫)। এজন্য প্রতি মিলেনিয়ামের প্রারম্ভে তারা যিশুর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় ক্রুসেডের সূচনা করে। ইরাক আক্রমণের আগে জর্জ বুশ ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েছিলেন সে কথা সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন। সবার মুখে এখন কেবল ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম।

৬. ইসলাম ও সনাতন ধর্মে জাতীয় বিধান থাকায় সৃষ্ট মানসিক সংকটঃ

ধর্মগ্রন্থে শরিয়াহ থাকা ও না থাকার পার্থক্যটি বাস্তব উদাহরণের দ্বারা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। কোর'আনে রাষ্ট্রীয় জীবনবিধান আছে, নিউ টেস্টামেন্টে তা নেই। একজন মুসলিম যখন জানতে পারে যে মদ্যপান, শুকর ভক্ষণকে আল্লাহ হারাম করেছেন তখন তার হৃদয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এটা তার ব্যক্তিজীবনের পছন্দ-অপছন্দকে দারুণভাবে প্রবাহিত করে। তাই অপর কোনো জীবনব্যবস্থা যখন মদ্যপানের বৈধতা দেয় তখন ঐ ব্যবস্থা সম্পর্কেও মুসলিমদের হৃদয়ে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। যদি কোনো মুসলিম মদ্যপান করেও তার ভিতরে অপরাধবোধ অবশ্যই জাগ্রত থাকে। এই অপরাধবোধ কিন্তু খ্রিষ্টানদের মধ্যে জাগ্রত হয় না, কারণ মদ্যপান তাদের ধর্মে নিন্দনীয় নয় বরং তা তাদের ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ অনুষঙ্গও বলা যায়। এ কারণে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা সহজেই মনগড়া বিধান মেনে নিতে পেরেছে কেননা এতে ঐ সবের প্রতি মনগড়া

বিধানগুলোতেও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

একইভাবে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। গণতন্ত্র যখন সুদকে জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করে তখনও মুসলিম হৃদয় তার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে। কিন্তু জাতীয় জীবনের একটি ব্যবস্থাকে ব্যক্তি যতই অপছন্দ করুক তা মানতে বাধ্য হয়। সে যদি সুদ গ্রহণ করেও তার ভেতরে হারাম ভক্ষণের দরুন বিবেকের দংশন থেকে যায় এবং এই অপরাধের জন্য সে রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই দায়ী করতে থাকে। আবার দণ্ডবিধির বেলায় মুসলিম দেখে যে, ইসলামে পূর্ণাঙ্গ দণ্ডবিধি আছে, কিন্তু রাষ্ট্র তা স্বীকার না করে অন্য দণ্ডবিধির প্রয়োগ করছে। যেহেতু তার বিশ্বাস বা ঈমানের কারণে সে আল্লাহর দেওয়া বিধান বা হুকুমকে ত্রুটিহীন ও ন্যায়সঙ্গত মনে করে তাই ইউরোপের চাপিয়ে যাওয়া ব্যবস্থার বিধানগুলো তার কাছে ইসলামবিরোধী অর্থাৎ কুফর বলেই মনে হয়। এটা মনে হয় কারণ কোর'আন তো হারিয়ে যায় নি। যতদিন কোর'আন থাকবে, মুসলিমরা এই দ্বিধা ও আত্মিক সংকট নিয়েই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মেনে চলবে। যারা সনাতনধর্মী তাদেরও দণ্ডবিধি আছে, হালাল-হারাম আছে। তাই তারাও পাশ্চাত্যের ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের ধর্মের অনুশাসনের সংঘাতটি অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু একজন খ্রিষ্টানকে এই বিশ্বাসের সংকট মোকাবেলা করতে হয় না, কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থে তো দণ্ডবিধি বলতেই কিছু নেই। মুসলিমরা যেন জাতীয় জীবনে ইসলাম চর্চা করতে আগ্রহী না হয় সেজন্য ব্রিটিশরা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় জীবনটাকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, গৌণ বিষয়ে পরিণত করে মুসলিমদেরকে মলমূত্র ত্যাগের সময় কী দোয়া পড়তে হবে, টয়লেটে কোন পা দিয়ে ঢুকতে হবে বেরোতে হবে, কুলুখ কীভাবে করতে হবে, কবীরা গুনাহ কয়টি, ছগিরা গুনাহ কোনটি, দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে, নারীর পর্দা কীভাবে করতে হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়কে মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা এই ষড়যন্ত্রে শতভাগ সফল হয়েছে, কারণ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম ঐগুলোকেই ইসলাম বলে মনে করে। পক্ষান্তরে জঙ্গিবাদীরা চুরি করলে হাত কাটা, ব্যভিচারীকে দোররা মারা, খুনিকে শিরোশ্ছেদ করা, নাচ-গান-ভাস্কর্য নির্মাণ নিষিদ্ধ করা, বিধর্মীদের থেকে জিজিয়া নেওয়া, মেয়েদেরকে অবরুদ্ধ করাকেই ইসলাম মনে করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ঐগুলিই তারা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।

৭. জঙ্গিবাদী ইসলামটি আত্মাহীন ও জবরদস্তিমূলক বিধায় অগ্রহণযোগ্যঃ

ইসলামের যে তালেবানী রূপটি আমরা দেখছি তা বর্তমান যুগের অমুসলিম তো বটেই, মুসলিমদেরও ঘোর অপছন্দ। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে পুরো মানবজাতিই ঘোর বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত আছে, তবে জঙ্গিদের পথভ্রষ্টতা ভয়ানক। কেননা তারা কোর'আন-হাদিসের অপব্যাখ্যাকে জোরপূর্বক অন্যের উপর চাপিয়ে সেটাকে ইসলাম বলে চালিয়ে দিতে সহিংস পন্থা অবলম্বন করছে। মানুষ জঙ্গিদের এই তথাকথিত 'শরিয়াহ শাসনকে' ভালোবাসে না ঘৃণা

করে, একে তারা হৃদয় থেকে আলিঙ্গন করবে না প্রত্যাখ্যান তারা এটা বিবেচনায় নিতে নারাজ। আল্লাহ বার বার বলেছেন যে, দীনের বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই (সুরা বাকারা ২৫৬)। ইসলামের এই মূলনীতিটি জঙ্গিবাদীরা অস্বীকার করেই হোক বা আকিদার বিকৃতির দরুন না বুঝেই হোক মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ধারণার একটি জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে চায়। তারা ১৪০০ বছরের দীর্ঘ সময়ে, বিশেষ করে গত কয়েক শতাব্দীতে মানবজাতির চিন্তার জগতে ও বাস্তব জীবনে যে অসম্ভব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাকে অস্বীকার করে যেটা প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেটাও এক বর্বরতা, জুলুম, অন্ধত্ব, নৃশংসতা, অন্যায়। তারা ইসলামকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তারা যেটাকে ইসলাম বলছে সেটা কোনোভাবেই আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, কারণ সেটা যেখানেই কার্যকর করা হয়েছে সেখানেই চরম দম বন্ধ করা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, শান্তি, স্বস্তি, স্বাধীনতা কিছুই প্রদান করতে পারে নি।

যে রাষ্ট্রগুলোতে কথিত ইসলামী ভাবধারার সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলোতে কেউ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। সুদানের মেয়ে মরিয়মের কথা হয়তো এখনো অনেকেরই মনে আছে। তার বাবা মুসলিম এবং মা খ্রিষ্টান। মরিয়ম নিজেও তার মায়ের ধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ২০১১ সনে একজন আমেরিকান খ্রিষ্টান ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। এটা যখন সুদান সরকার জানতে পারে তখনই মরিয়মকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারণ শরিয়া আইনের দৃষ্টিতে মরিয়ম পিতার ধর্ম স্বীকার করে মুসলিম হতে বাধ্য আর মুসলিম মেয়ে খ্রিষ্টান ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না। কারাগারেই জন্ম নেয় তার একটি সন্তান। ধর্ম ত্যাগ করার অপরাধে আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে পাশাপাশি খ্রিষ্টানকে বিয়ে করায় 'ব্যভিচারের দণ্ড' হিসাবে ১১০টি দোররা মারার হুকুম প্রদান করে। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে নি সুদান সরকার কারণ মানবাধিকার সংগঠন ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর নজিরবিহীন চাপের মুখে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে খালাস দিতে বাধ্য হয় তারা। এটা হচ্ছে অনুরূপ অসংখ্য ঘটনার মাঝে একটি ঘটনা যা আমরা জানতে পারছি গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হওয়ায় বদৌলতে। কিন্তু আশির দশক থেকেই সুদানে চলছে এহেন শরিয়াহ শাসন।

প্রশ্ন হচ্ছে এইটা কি আল্লাহ-রসুলের ইসলাম হলো? না। তা কখনোই হতে পারে না। প্রকৃত ইসলাম মানুষকে তার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল। যারা ইসলাম ত্যাগের পর ইসলামের বিরুদ্ধে, সমাজের শান্তির বিরুদ্ধে প্রবল শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে রসুলাল্লাহ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করেছেন। কিন্তু মরিয়ম তো এমন কিছু করে নি। তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা কোথায় গেল? এটা যদি জবরদস্তি না হয় তাহলে জবরদস্তি কাকে বলে? সুদানের মতো মোটামুটি মধ্যপন্থী দেশেও যদি ধর্মীয় স্বাধীনতার এই অবস্থা হয় তাহলে আই.এস. বা তালেবানের

মোল্লাতান্ত্রিক শাসনে মানুষকে কেমন অবরুদ্ধ করা হয় তা সহজেই অনুমেয়। তারাও আদতে সেই ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদীদের মতোই ওপর থেকে একটি জীবনব্যবস্থা বলপূর্বক একটি জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যা গ্রহণ করতে পৃথিবীর মানুষ এমন কি মুসলিমরাও প্রস্তুত নয়।

তালেবান শাসনে প্রাচীন আমলের বৌদ্ধমূর্তিগুলো ধ্বংসের ঘটনা তাদের অন্ধত্বের প্রমাণ। কেননা আফগানিস্তানের বামিয়ান এলাকা ইসলামের আওতায় প্রথম এসেছিল খলিফা ওমরের (রা.) যুগে। তখন রসুলাল্লাহর সাহাবীরা এই মূর্তিগুলোকে ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করলে ভেঙ্গে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেন নি। আমর ইবনুল আস (রা.) আলেকজান্ড্রিয়াতে কপটিক খ্রিষ্টানদের আরাধনার জন্য যিশুর (আ.) মূর্তি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি অনেকেরই জানা, তবু সংক্ষেপে আবার বলছি।

আমর ইবনুল আস (রা.) এর মিসর বিজয়ের পর আলেকজান্দ্রিয়ায় কে একজন একদিন রাত্রে যীশু খ্রীস্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রিষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা ধরে নিল যে, এটা একজন মুসলিমেরই কাজ। আমর (রা.) সব শুনে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রিষ্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্যরূপ। তারা বলল, "আমরা চাই আপনাদের নবী মোহাম্মাদের (দ.) প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনিভাবে তাঁর নাক ভেঙ্গে দেব।"

এ কথা শুনে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন আমর (রা.)। প্রাণপ্রিয় নবীজির প্রতি এত বড় ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি দেখে তাঁর ডান হাত তলোয়ার বাটের উপর মুষ্ঠিবদ্ধ হয়। ভীষণ ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বোললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি।" পরদিন খ্রিষ্টানরা ও মুসলিমরা বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। আমর (রা.) সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন, "এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের ধর্মের হয়েছে, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাক কেটে দিন।" এই কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রিষ্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব।

সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বলল, "থামুন ! আমি ঐ মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। অতএব আমার নাক কাটুন।" বর্তমান বিকৃত ইসলামের ধারণায় অন্যধর্মের উপাসনালয়ের মূর্তি ভাঙ্গা আর প্রকৃত ইসলামের সৈনিকদের দ্বারা অন্যজাতির পূজার জন্য মূর্তি বানিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত ইসলাম আর বিকৃত ইসলামের ধারণাগত বিস্তর ফারাক। যাক সে

কথা। বিজিতদের উপরে বিজয়ীদের এই উদারতায় ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে সেদিন শত শত খ্রিষ্টান ইসলাম কবুল করেছিলেন। এই হচ্ছে ভিন্ন ধর্মের অবতার বা মহামানবদের ভাস্কর্যের প্রতি রসুলের আসহাবদের সম্মান প্রদর্শনের নমুনা। অথচ ধর্মান্ধ জঙ্গিরা আজ বোমা মেরে বুদ্ধের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে ইসলামের দোহাই দিয়ে। তারা কি রসুলের আসহাবদের থেকেও বেশি ইসলাম জানেন? না, সেটা সম্ভব নয়। যে জীবনব্যবস্থা তা ধর্মভিত্তিকই হোক বা ধর্মনিরপেক্ষই হোক, মানুষের মন-মানসিকতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল ও প্রতিকূল হলে, তা যুগের তৃষ্ণা মেটাতে না পারলে, তা যুগের চাহিদা বলে পরিগণিত না হলে সেটা প্রতিষ্ঠিত হলেও শান্তিময় হবে না, টেকসই হবে না।

৮. শোষণের টাকায় পাশ্চাত্য উন্নতি করেছে, গণতন্ত্রের আশীর্বাদে নয়ঃ

পশ্চিমা সমাজবিদদের ভাষায়, 'প্রাচ্যের সমাজ বিশ্বাসভিত্তিক (Faith based)।' সে কারণেই এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা টেকসই হচ্ছে না, কয়েক শতাব্দী ঝাঁকাঝাঁকি করা সত্ত্বেও তেলে জলে মিশছে না। এ জাতির জন্য বিষয়টা এমন হয়েছে যে, দীর্ঘদিন থেকে যে শিশুটি দুধ পান করে আসছিল তাকে ভুল বুঝিয়ে মার্বেল খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। মার্বেলগুলো পেটের মধ্যে গিয়ে জায়গা দখল করে আছে। হজমও হচ্ছে না, শরীরকে পুষ্টও করছে না বরং পেটে ব্যথার সৃষ্টি করছে। শিশুটি চিৎকার করে কান্না করছে আর মার্বেলগুলো উগরে দেবার চেষ্টা করছে। তাই তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্র শিশুই থেকে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শত শত বছর ধরে উপনিবেশ স্থাপন করে দুনিয়া শোষণ করেছে, তারা বিরাট সম্পদের পাহাড়ে বসে আছে। এখনো পুঁজিবাদের শুঁড় দিয়ে দুনিয়ার সম্পদ শোষণ করে যাচ্ছে। এই বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে তারা দুনিয়ার মেধাবী মানুষগুলোর মেধাকে কিনে নিয়েছে, তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে অকল্পনীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধন করেছে। আকাশ, সমুদ্র, মেরু, মরু, পাহাড় সবই এখন তাদের হাতের মুঠোয়। তাদের বৈষয়িক উন্নতি দেখে আমরাও চাই তাদের মতো হতে, আমরা ভুলে যাই যে, তাদের অত্যাধুনিক শহরগুলোর ইট-বালু-সিমেন্টে মিশে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও অস্থি, রক্ত, মাংস। ব্রিটেনের রানীর মুকুটে এখনো দিল্লির কোহিনূর শোভা পায়। এহেন সম্পদলোভী, আত্মাহীন পশ্চিমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, কৃষ্টি-কালচার অন্ধভাবে অনুকরণ করার মানসিক দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। তাদের অধিকাংশ মানুষ দু স্লাইস পাউরুটিতে জেলি মাখিয়ে খেয়ে কাজে যায় পক্ষান্তরে আমাদের দেশের চাষী লবণ মরিচ দিয়ে পান্তাভাত পেটপুরে খেয়ে লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যায়। এই চাষীকে যদি বলা হয় দুই পিস পাউরুটি খেয়ে হালচাষ করতে সেটা যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব বাংলাদেশে তাদের অনুকরণে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের নামে জাতীয় জীবনে ধর্মহীনতার চর্চা করে সামাজিক শান্তি, সুশাসন, উন্নয়ন, প্রগতি নিশ্চিত করা। তাছাড়া তাদের দেশেও কি ধর্মনিরপেক্ষতা শান্তিপূর্ণ ফল দিয়েছে? মোটেও না। তারা ভোগবিলাস আর আরাম আয়েশে আছে বটে

কিন্তু তাদের নৈতিক অবক্ষয় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আত্মহত্যার প্রবণতা এই উন্নত দেশগুলোতে সর্বাধিক, হত্যা ধর্ষণসহ যাবতীয় সামাজিক অপরাধেও তারা সবার অগ্রবর্তী। প্রযুক্তি যত অগ্রসর হচ্ছে তারা তত অত্যাধুনিক অপরাধের উদ্ভাবন ঘটাচ্ছে। তারা দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে, তিন নম্বরটি ঘটাতে যাচ্ছে। তথাপি আমাদের চোখে তারাই শ্রেষ্ঠ, আমরা ক্রিম লাগিয়ে আমাদের চামড়ার রঙ পর্যন্ত তাদের মতো করতে চাই। তাদের সকল প্রতারণাও আমরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি।

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, গণতন্ত্র এখন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের রিমোট কন্ট্রোল যার দ্বারা তারা অতীতের উপনিবেশগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও শোষণকে বজায় রাখছে। তারা নিজেরাও যে গণতন্ত্রকে বেদবাক্য জ্ঞান করে, তা কিন্তু নয়। তারা যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেখানে সেটা ব্যবহার করে। তারা বিশ্বাসঘাতক আরবদের রাজতন্ত্রকে তেলের বিনিময়ে সহ্য করে যাচ্ছে। মিশরে তারাই সামরিক সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত মুরসি সরকারকে ধ্বংস করেছে। এমনকি নিজেদের ব্রিটেনে এখনো রাজতন্ত্রকে জাতির ঐক্যসূত্র হিসাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো ঐক্যসূত্র তারা রাখতে দেয় নি। তাই যে কোনো বিষয়ে আমরা শতধাবিভক্ত। এমন স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ এই দুটো বড় বিভক্তি স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর নিষ্পত্তি করা যায় নি। ইচ্ছা করে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা মহাজ্ঞানী কিন্তু এটা বুঝতে অক্ষম যে ঐক্যসূত্র ছাড়া কোনো জাতিই সমৃদ্ধি অর্জন তো দূরের

শরিয়তপুরে গণমানুষের মাঝে লেখক (জুন ২০১৫)।

স্বদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা ও মদীনা সনদ প্রসঙ্গ

বর্তমানে আমরা জাতি হিসাবে দ্বিধাগ্রস্ত, ধর্মকে নেব না আধুনিকতাকে নেব? আমাদের অনেকের নামের মধ্যেও এই দ্বন্দ্বটি প্রকটিত হয়। ভালো নামটি রাখা হয় ইসলামিক ভাবধারায় আর ডাক নামটি আধুনিক অর্থাৎ ইংরেজি, বাংলা বা কোনোটাই নয় এমন অর্থহীন শব্দে। দুই প্রজন্মের দুই মানসিকতার ব্যক্তির অবদানে নামের এই বিচিত্র রূপ সৃষ্টি হয়। ধর্ম আর আধুনিকতা - এ দুটি বিষয় যেন একে অপরের শত্রু। ধর্মকে কোনোভাবেই আধুনিক করা গেল না। আর আমরা কোনটাই ছাড়তে পারছি না, তাই দুই নৌকায় পা দিয়ে আছি আমরা।

পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি আমাদের উজ্জ্বল আকর্ষণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, তার প্রভাবে ধর্ম ক্রমেই বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্তের কণিকায় মিশে আছে যা বাদ দেওয়া সহজ কাজ নয়। তবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীগুলোতে চালানো হয়েছে তা খুবই সফল হয়েছে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে আস্থাহীন ধর্মচর্চার রশিতে ঝুলে আছে সন্দেহবাদী শিক্ষিত সমাজ। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে রাখা হয়েছে নামমাত্র। ধর্ম বইতে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছুর মালিক স্রষ্টা। অথচ অন্য কোনো বইয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, পরোক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। কৌশল করে ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষা বইতে যতটুকু ধর্ম শেখানো হয়েছে তার পুরোটাই ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়, সামষ্টিক জীবন কীভাবে চলবে তা শেখানোর জন্য আছে অন্যান্য বিষয়সমূহ। বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আদ্যিকালের পুরাতন স্রষ্টার আধুনিক জীবনের জটিলতার সমাধান করার মতো জ্ঞান নেই, তাই এ বিষয়ে তিনি নীরব। মানুষের মনকে ধর্মবিমুখ ও অবজ্ঞাপ্রবণ করে তোলার এটি হচ্ছে একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া।

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' দর্শনটি উনিশ শতকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রথমত উদ্ভূত হয়েছে। বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারিতেও Secular-(অর্থ) পার্থিব, ইহজাগতিকতা, জড়, জাগতিক। আর Secular State অর্থ 'গীর্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র'। অর্থাৎ ধর্মের বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র। Secularism অর্থ

নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়- এই মতবাদ। জাগতিকতা, ইহবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও ডিকশনারির অর্থ দেখলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মূলত ধর্মহীনতাকেই বোঝায়।

Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে যে Secular ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যিনি আধ্যাত্মিক বিষয় বা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নন (Not connected with spiritual or religious matter). অর্থাৎ ইউরোপে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ হয় তখন তা মূলত ধর্মহীনতার ধারণাকেই ভিত্তি করেছিল। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই বাস্তবতার নিরিখে ধর্মহীনতা শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিসংগত হবে না বিধায় একটি প্রতারণামূলক শব্দ "ধর্মনিরপেক্ষতা" তারা ব্যবহার করতে শুরু করল কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যাত্রা অবিচল রইল। তাদের অনুকরণে আমাদের দেশের সংবিধানেও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে "ধর্মনিরপেক্ষতা" প্রবেশ করানো হলো। এর ব্যাখ্যা নিয়ে শুরু হলো বহু আলোচনা-সমালোচনা। আলেমদের একটি বড় অংশ এই প্রশ্নে দেশের সংবিধানকে কুফরি সংবিধান বলে ফতোয়া দিচ্ছেন।

প্রথাবিরোধী সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ একটি সাক্ষাৎকারে ধর্মহীনতাই যে প্রগতিবাদীদের মূল গন্তব্য তা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখি সমাজটা খ্রিষ্টধর্ম থেকে মুক্ত নয়। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা সংস্কৃতি ও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসাবে খ্রিস্টধর্ম প্রবলভাবেই বিদ্যমান। শুধু ধর্মকে রাষ্ট্রের আইন বা বিধিবিধান প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে না। কিন্তু সমাজে তো চার্চের ভূমিকা আছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি তাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে কিন্তু সমাজ তো ধর্মমুক্ত নয়। তাছাড়া ধর্মকে সমাজ থেকে মুক্তি দেয়া ওইসব বুর্জোয়া সংবিধান বা রাষ্ট্রের লক্ষ্যও নয়। কিন্তু আমাদের দেশে রাষ্ট্রকে যতটা না সেক্যুলার করার জন্য লড়ছে প্রগতিশীলরা- তারচেয়ে বেশি লড়ছে সমাজকে ধর্মমুক্ত করতে। আমাদের এখানে ধর্ম ঐশ্বরিকতা হারিয়ে ফেলেছে। তবে মানুষ তার সৃষ্টিশীলতা মননশীলতা দিয়ে একদিন ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ কেন, ধর্মমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। (৩ জুন ২০০৪, দৈনিক যুগান্তর)।

কথা হচ্ছে ডিকশনারিতে যা-ই থাকুক আর প্রগতিশীলদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ যেমনই হোক, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা কী হবে, চর্চা কেমন হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার অবশ্যই সরকারের আছে। ৪৪ বছর ধরে অস্পষ্ট থাকা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কেননা রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের আত্মার যোগসূত্র থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় অপরাজনীতি, জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করা যাবে না। আমরা কীভাবে আমাদের রাষ্ট্র চালাব সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে, বাঁদরের মতো পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ করা পরিত্যাগ করতে হবে। পশ্চিমাদের থেকে যদি

চলনসই কিছু থাকে তা অবশ্যই গ্রহণ করব, কিন্তু ক্রীতদাসের মতো অন্ধ আনুগত্য থেকে আমাদের বিরত হতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত নিতে হলে ধর্ম ইস্যুটি বার বার সামনে চলে আসবে। অন্য যে নীতিগুলো আসবে না সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রমাণ দিই একটা। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তর সালের সংবিধানে ফেরত যাওয়ায় রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে 'সমাজতন্ত্র'ও ফিরে এসেছে। কিন্তু সকলেই জানে যে, বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র। বাহাত্তর সালে সংবিধানে যখন সমাজতন্ত্র ছিল তখন তো বিশ্বের বড় বড় দুটি রাষ্ট্রে রাশিয়া ও জার্মানে সমাজতন্ত্র চালু ছিল, এখন সেগুলো ধনতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য। **অথচ আমরা এখন ফিরিয়ে এনেছি 'সমাজতন্ত্র', কিন্তু চলছি পুঁজিবাদী নীতিতে। বাঘা বাঘা সমাজতান্ত্রিকরা পুরো গণতন্ত্রের জোব্বা গায়ে দিয়ে পাক্কা বুর্জোয়া বনে গেছেন।** এটা নিয়ে কোন বিশ্লেষণ নেই, ঝগড়া-ঝাটিও নেই, সব ঝগড়া এই ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্ম নিয়ে। কারণ বর্তমানে ধর্মই বিশ্বের এক নম্বর ইস্যু।

সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৩৯ ও ৪১ ধারা অনুযায়ী সকলেরই এখানে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন।"

আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ধর্মনিরপেক্ষতার কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেটার আলোকেই এই ভূখণ্ডে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' দর্শনটির চর্চা করা হবে। তিনি ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে দুর্গাপূজার উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মানে ধর্মহীনতা নয়। এর মানে হলো দেশের সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে যার যার ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনের।'

অর্থাৎ তিনি পাশ্চাত্যের আচরিত বা এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রদত্ত ধর্মহীনতার পক্ষে নন। তিনি আমাদের দেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ধর্মহীনতা যেখানেই চলুক অন্তত আমাদের এদেশে তা চলনসই নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলেছেন, 'আমাদের প্রিয় নবী করিম (সা.) তার মদিনা সনদ ও বিদায় হজ্বে যেটা বলে গেছেন, ঠিক সেভাবেই এই দেশ চলবে। বাংলাদেশ একটি রাজাকার, আল বদরমুক্ত গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক দেশ হবে। মদিনা সনদে সব ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধিকার যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, আমরা তার আলোকে অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে তুলব।" (প্রথম আলো, ২২ মার্চ ২০১৪)। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

মদিনা সনদ কী ছিল?

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী মদিনায় হিজরত করেন। এসময় সেখানে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ছিল গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ। তাই কলহে লিপ্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ৪৭ ধারার একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে মদিনা সনদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত নীতিগুলো এখানে বলতে হয়:

১) সনদপত্রে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে।

২) মুহাম্মদ (স.) এই সাধারণ জাতির নেতৃত্ব দিবেন।

৩) কোন সম্প্রদায় গোপনে কোরায়েশদের সাথে কোন প্রকার সন্ধি করতে পারবে না কিংবা মদিনা বা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কোরায়েশেদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না।

৪) মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, পৌত্তলিক ও অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। কেউ কারো ধর্মীয় কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৫) মদিনার উপর যে কোন বহিরাক্রমণকে রাষ্ট্রের জন্য বিপদ বলে গণ্য করতে হবে। এবং সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য সকল সম্প্রদায়কে এক জোট হয়ে অগ্রসর হতে হবে।

৬) কোন লোক ব্যক্তিগত অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই বিচার করা হবে। তজ্জন্য অপরাধীর সম্প্রদায় কে দায়ী করা যাবে না।

৭) মুসলমান, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর বন্ধুসুলভ আচরণ করবে।

৮) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির অধিকার থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের এবং তিনি হবেন সর্বোচ্চ বিচারক।

এখানে ৪, ৬ ও ৭ নম্বর ধারাগুলো সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানকে নিশ্চিত করে যা ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটিকে প্রধানমন্ত্রী যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল। একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী ধর্ম নিয়ে বিকৃত রুচির লেখালেখি না করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, "আমরা ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সেক্যুলারিজম মানে ধর্মহীনতা নয়। তাই কেউ ধর্ম মানবে কি মানবে না, সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু অন্যের ধর্মে আঘাত দিতে পারবে না। বিকৃত লেখা মানবিক গুণ নয়। কারও অনুভূতিতে যেন আঘাত না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ রাখাই মানবিকতা।" (দৈনিক ইত্তেফাক ৯ নভেম্বর ২০১৫)।

যে কোনো ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "কোনো ধর্মের অবমাননা বরদাশত করব না। নবী করিম (স.) কে কটূক্তি করলে আমরা মানব না। ব্যবস্থা নেবই।" এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোকে 'অপরাধ' হিসাবে দেখছেন, 'মত প্রকাশের অধিকার' হিসাবে

নয়। এ বিষয়টিও ইতিবাচক। জাতির ঐক্য রক্ষা ও রাষ্ট্রের অরাজকতা প্রতিরোধের জন্য স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, তার এই বক্তব্য রাজনীতিক বক্তব্য নয় বরং বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঈমান-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই তিনি পাশ্চাত্যের ধর্মহীনতার নীতি পরিহার করেছেন যা অত্যন্ত যৌক্তিক। তিনি অন্তত অনুধাবন করেছেন যে পাশ্চাত্যের ঐ ধর্মহীনতার নীতি আমাদের সমাজে খাপ খাবে না। কিন্তু মদিনা সনদের সঙ্গে সংবিধানের কিছু ধারা মিললেও বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অমিল রয়ে গেছে। মদিনা সনদের সার্বভৌমত্বের অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন আল্লাহ কেননা রসুলাল্লাহ তো আল্লাহর বিধান মোতাবেকই সিদ্ধান্ত দিবেন। এটাই হচ্ছে মদিনা সনদের ভিত্তি, গোড়া। পক্ষান্তরে আমাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তিটা কিন্তু রয়ে গেছে সেই পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উপর। একটি বাড়ি তাজমহলের মতো কারুকার্যময় ও পিরামিডের মতো মজবুত হলেও তার ভিত্তি যদি হয় বালুর উপরে তাহলে সেই বাড়ি ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু পশ্চিমাদের প্রকল্পিত ধর্মনিরপেক্ষতা যার যার ধর্মপালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের সুদূরপ্রসারী চেষ্টা ছিল ধর্মই থাকবে না। জাতীয়, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এটাকেই তারা এতদিন থেকে চাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের জনমনে তা গৃহীত হয় নি। আমাদের শাসকশ্রেণি ও সংবিধান রচয়িতাগণ ধীরে ধীরে এ এলাকার মানুষের সেন্টিমেন্টকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেটাকে তারা বিবেচনা করেছেন। এজন্যই মদিনা সনদের কথা আসছে, রাষ্ট্রধর্ম, বিসমিল্লাহ দিয়ে সংবিধান শুরু করার বিষয়গুলো এসেছে। আমাদের শাসকরা ধর্মহীনতা পর্যন্ত যেতে পারেন নি।

কিন্তু এক শ্রেণির তাত্ত্বিক যারা পশ্চিমাদের খেয়ে পুষ্ট হয়েছেন, তারা বার বার জাতিকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি জীবনে ধর্মহীনতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু ভোটারদের সেন্টিমেন্ট চিন্তা করে শাসকশ্রেণি অত্যন্ত সচেতনভাবে ঐ সীমারেখা রক্ষা করে চলেছে। আমাদের প্রধামন্ত্রীও সেই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন, পশ্চিমাদের নীতি যে এখানে চলবে না এটা তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন। এজন্যই তিনি স্পষ্টত ধর্মকে আক্রমণকারীদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ কথাটি গণমাধ্যমগুলোকেও বুঝতে হবে, বাম ঘরানার রাজনীতিক ও তাত্ত্বিকদেরকেও বুঝতে হবে। না বুঝলে কচ্ছপের শরীরে বকের মাথা জুড়ে বকচ্ছপ হয়েই থাকতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান, নিজ জাতির পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করুন। দেশের স্বাধীন সত্ত্বা, সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ঐ অর্থহীন চেষ্টা থেকে বিরত হোন। অনেক চেষ্টা করেছেন, সব গুড়ে বালি। রাশিয়ার মতো কট্টর কমিউনিস্ট, নাস্তিক শাসনব্যবস্থার দেশ যারা বিগত শতকে

কেবল মসজিদ, গীর্জা ভেঙেই এসেছে তারাও এখন মস্কো শহরে মসজিদ নির্মাণ করছে এবং মুসল্লিদের সঙ্গে পুতিন বুক মেলাচ্ছেন। এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আমরা পাশ্চাত্যের চশমা দিয়ে দেখতে এতটাই অভ্যস্ত যে, জঙ্গিবাদ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আমরা ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি, মানবতাবাদ ইত্যাদি উপস্থাপন করি, সমস্যার গোড়া কোথায় তা ভেবে দেখি না। এতে আমাদের কথাগুলো হয়তো এক শ্রেণির পাঠক-শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে কিন্তু জঙ্গিবাদীদের কাছে অর্থহীন। নাস্তিককে কোর'আন দেখানো যেমন কামারশালায় কোর'আন পাঠ, তেমনি জঙ্গিবাদীদের কাছেও সেক্যুলার যুক্তির কোনোই আবেদন নেই। তারা শুধু ধর্মীয় কেতাবে বিশ্বাসী। এই সত্যটি এখন অনেকেই উপলব্ধি করছেন। যেমন আমাদের দেশের সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান বলেছেন, 'আমাদের জঙ্গিকে মোকাবেলা করতে হলে অনেক পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে। জঙ্গিদের মোকাবেলা কোর'আন-হাদিস দিয়ে করতে হবে, সেক্যুলারিজম দিয়ে এটা কে মোকাবেলা সম্ভব নয়'। (চ্যানেল আই 'তৃতীয় মাত্রা' ১৯ অক্টোবর ২০১৫)

ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি অপরিহার্য

বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে চলমান যুদ্ধ ও রক্তপাতের অন্যতম কারণ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। যে যুদ্ধগুলো আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতিক ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের জের হিসাবে ঘটছে বলে মনে হয় সেগুলোর গভীরে গেলেও দেখা যায়, এর শেকড় প্রোথিত আছে ধর্মবিদ্বেষের ভূমিতে। সভ্যতার মান রাখতে ধর্মনিরপেক্ষতার আচকান গায়ে চাপিয়ে মূলত সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে যাচ্ছে বিভিন্ন 'ধর্মানুসারী' উগ্র পরাশক্তিগুলো।

বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর মাঝখানে যেমন দাঁড়িয়ে আছে অনেক উঁচু প্রাচীর, তেমনি প্রতিটি ধর্মের মধ্যেও আছে বাদানুবাদ, ফেরকা, মাজহাব। মুসলমানদের ভিতরে আছে শিয়া সুন্নী। সুন্নীদের মধ্যে আছে মালেকি, শাফেয়ী, হাম্বলি, হানাফি। শিয়াদের মধ্যেও আছে বহু ভাগ। আছে বহু সুফি তরিকা। একেক দেশে একেক চেহারার ইসলাম। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও আছে ক্যাথেলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট, সনাতন ধর্মীদের মধ্যে আছে বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান, হীনযান প্রভৃতি। এ ফেরকাগুলোর মধ্যে রয়েছে শত্রুতার সম্পর্ক। এই সব বিভক্তিকে কালে কালে স্বার্থের হাতিয়ার বানিয়েছে শাসক ও রাজনীতিক গোষ্ঠী, কায়েমী স্বার্থবাদীরা। তারা অর্থ দিয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের কিনে নিয়েছে। ধর্মের ধ্বজাধারীরা মানুষের

ঈমানকে, ধর্মীয় আবেগকে নিজেদের ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনুকূলে প্রবাহিত করে ধর্মকে কালিমালিপ্ত করেছে। পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ দুর্যোগ। এরই পরিণামে ইউরোপে মধ্যযুগে ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ব্যক্তিজীবন থেকে বাদ দিতে পারে নি। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিজ ধর্মমতে উপাসনা ও ব্যক্তিগতভাবে চর্চা করার স্বাধীনতাটা দিয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ধারণার উপরে পাশ্চাত্যের এবং তাদের অনুসরণে আমাদের সংবিধান রচিত হয়েছে। সংবিধান নামক কিতাবে লেখা আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন। [প্রথম ভাগ (প্রজাতন্ত্র), ধারা ২ক] ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনীতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে। [সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি), ধারা ১২]।

এই নীতি পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্র সেনাবাহিনী, পুলিশ দিয়ে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা পাহারা দিচ্ছে। বিরোধাত্মক সম্প্রদায়ের কেউ এসে যেন কোনো নাশকতামূলক ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি যেমন বড়দিন, ঈদ, পূজা, পূর্ণিমা তিথি ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যাপক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করছে। কিন্তু গত একশ বছরে সাম্প্রদায়িক হামলা, উপাসনালয়ের উপর পারস্পরিক হামলা কমে নি বরং বেড়েছে, বিদ্বেষ কমে নি, বরং বেড়েছে, এক ধর্মকে আক্রমণ করে আরেক ধর্মের পণ্ডিতদের লেখালিখি কমে নি, বরং বেড়েছে। দাঙ্গার সম্ভাবনা সব সময়ই বিরাজ করছে। সময় সুযোগ পেলে ধর্মবিদ্বেষ আগুনের মতো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এখনো বাক-স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার নামে ভিন্ন ধর্মের নবী-রসুল-অবতারদের বিষয়ে অশ্লীল সাহিত্য, অবমাননাকর চলচ্চিত্র, ব্যাঙ্গচিত্র আঁকা হয় এবং কথিত সভ্য দেশগুলোতেও এর ব্যাপক চর্চা হয়। এমন কি মোহাম্মদ (দ.) এর উপর কার্টুন আঁকার প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়ে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বর্গভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে এন্টি ইসলামিক শ্লোগান লেখা টি-শার্টের ব্যবসা করা হয়, র‍্যালি করা হয়। এবং এ সবই করা হয় বাক-স্বাধীনতা (Freedom of speech) এর নামে। এসবের দ্বারা যদি কখনো কোনো মুসলিম আত্মসংবরণ করতে না পেরে হামলা চালিয়ে বসে, অমনি সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের অনুসারীরা শেয়ালের মতো একসুরে চিৎকার শুরু করে দেয় যে মুসলিমরা সন্ত্রাসী। অথচ অপরাধ সংঘটনের উস্কানি প্রদানও যে বড় অপরাধ তা এক্ষেত্রে গৌণ হয়ে যায়। আমাদের দেশের সংবিধানে এও আছে যে, নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠন করা ও তার সদস্য হওয়া যাবে না।

আমরা দেখি, পার্শ্ববর্তী দেশে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী কর্তৃক গো-মাংস ভক্ষণ নিয়ে সহিংসতা সৃষ্টি করা হয়, মানুষ হত্যা করে ফেলা হয় তার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়ে। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নৃশংসতার দ্বারা ক্ষুব্ধ মুসলমান রামুতে মঠ ভেঙ্গে ফেলে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সংবিধান যতই উন্নত হোক, সকল ধর্মের উপাসনাকেন্দ্রের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হোক, যতই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাহারার ব্যবস্থা করা হোক কিন্তু এক ধর্মের লোকেরা যতদিন না অন্য ধর্মকে সম্মান করতে শিখবে ততদিন অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গেও তাদের বিদ্বেষ দূর হবে না, শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা। আন্ত-সাম্প্রদায়িক ঘৃণা যতদিন থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকথা কেতাবেই থেকে যাবে। **সকল সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যদি ঐক্যের কোনো সূত্র দেখানো না যায়, তবে কোনদিনও এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বন্ধ হবে না।** কারণ ধর্মব্যবসায়ীদের করা ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যাই এই বিভেদের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এখানেও একই কথা, সেক্যুলার মানবতাবাদ দিয়ে নয়, সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলা করতে হবে ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারাই, ধর্মগ্রন্থাদিতে উক্ত বাণী দ্বারাই।

এই আন্তধর্মীয় ঐক্য সৃষ্টির জন্য যে ঐক্যসূত্র অপরিহার্য তা আমরা বই, পত্রিকা ও প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরছি। আমরা বলছি যে, ধর্মগুলোর উপাসনা পদ্ধতিতে তারতম্য থাকলেও প্রতিটি ধর্মের উদ্দেশ্য ও মৌলিক শিক্ষাগুলো অভিন্ন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে বলছি, আপনারা যে মুসলমানদেরকে ঘৃণা করছেন অথচ পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ ইসলামকে বলেছেন দীনুল কাইয়্যেমা যার অর্থ সনাতন, শাশ্বত, চিরন্তন জীবনবিধান বা ধর্ম। সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই পিতা-মাতা অর্থাৎ ইসলাম ধর্মমতে আদম-হাওয়া, খ্রিষ্টান ধর্মমতে অ্যাডাম-ইভ, সনাতন ধর্মমতে আদম-হব্যবতীর সন্তান। সুতরাং আপনারা যে অন্য ধর্মকে অবহেলা করছ, অথচ সেগুলোও একই স্রষ্টার প্রেরিত ধর্ম যা কালের প্রবাহে বিকৃত হয়ে গেছে। তথাপি তাদের ধর্মগ্রন্থ আর আপনার শাস্ত্র মিলিয়ে দেখুন হাজার হাজার মিল খুঁজে পাবেন।

আবার মুসলিমদেরকে বলতে হবে যে তাদের সনাতনধর্মীদের মূল শাস্ত্রগুলো তথা তাদের ধর্মও এসেছে আল্লাহরই কাছ থেকে। সনাতন ধর্মের অবতার আর ইসলামের নবী-রসুল আসলে একই বিষয়। তারা সবাই মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় শিক্ষা দিতেই এসেছিলেন। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করেছেন যেভাবে ইসলামের নবীরা সংগ্রাম করে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেটা না বুঝে আপনারা আল্লাহর একজন নবীকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসছেন অথচ আরেক নবী শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিচ্ছেন, কোর'আনকে চুমু খাচ্ছেন আর বেদ-মনুসংহিতাকে অবমাননা করছেন, এই গালি, অসম্মানতো আল্লাহকেই করা হচ্ছে।

খ্রিষ্টানকে বলছি, আপনারা যে ঈসার (আ.) মূর্তি বানিয়ে তাঁর মহীমাকীর্তন করছেন

আর মোহাম্মদকে (দ.) গালি দিচ্ছেন। অথচ যেই ঈসা (আ.) মোহাম্মদকে (দ.) কত শ্রদ্ধা করেছেন, আবার মোহাম্মদও (দ.) যিশু খ্রিষ্টকে, মুসাকে (আ.) ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। কাজেই তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না, কিন্তু তাদের অনুসারীরা তাদের পথ থেকে সরে গিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়ে সেই মহামানবদেরকেই কালিমালিপ্ত করে চলেছে। এখন সবাইকে বলতে হবে যে, মুসলিমরা, আপনারা আপনাদের কোর'আন থেকে সরে গেছেন, খ্রিষ্টান বাইবেল থেকে সরে গেছেন, হিন্দুরা বেদ থেকে, ইহুদিরা তাওরাত থেকে সরে গেছেন। কাজেই আপনাদের কারোই এখন কোনো ধর্ম নেই, আপনারা সবাই এখন পশ্চিমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের অনুসারী। সেই মহা প্রতারক আপনাদের সবাইকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। আপনারা সবাই এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার হুকুম (তওহীদ) থেকে সবাই সরে গেছেন। ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে এই শিক্ষা সবাই ভুলে গেছেন। শিকড়বিহীন বৃক্ষ যেমন মরা কাষ্ঠখণ্ড তেমনি মানবতাবিহীন ধর্ম অর্থহীন। মরা কাঠ তবু জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগে, কিন্তু বিকৃত ধর্ম কোনোই কাজে আসে না, তা উল্টো মানুষের ক্ষতি করে। আজ যখন মানবতা ভূলুণ্ঠিত, বোমার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে মানুষ, ধর্ষিতা হচ্ছে ৩ বছরের শিশু, লাঞ্ছিত হচ্ছে নারী তখন সবার ধর্মবিশ্বাস অর্থহীন হয়ে গেছে। যতদিন না এই নারকীয় অশান্তি থেকে মানুষকে রক্ষা না করবেন ততদিন আপনাদের সব ধর্মপরিচয় ও ধর্মপালনের দুই পয়সারও মূল্য নেই।

ধর্মের এই সত্যটি তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাতে হবে। তাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে, এক বাবা-মায়ের সন্তান হিসাবে ঐক্যচেতনা জাগ্রত করতে না পারলে সংবিধানের শুষ্ক ধারা-উপধারায় কোন লাভ হবে না। 'ধর্ম যার যার - উৎসব সবার' এ জাতীয় শ্রুতিসুখকর শ্লোগান আত্মার গভীরে থাকা কলুষতা ও বিদ্বেষকে সাফ করতে পারবে না। তাছাড়া ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বিভিন্নভাবে পারস্পরিক বিদ্বেষ জিইয়ে রাখছেন। তারা নিরবধি প্রচার করে যাচ্ছেন যে, বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, হিন্দুরা জঘন্য মানুষ, অমুক খাবার হিন্দুদের, বাংলা ভাষাও হিন্দুদের, এই ভাষায় সন্তানের নাম রাখাও হিন্দুয়ানী ইত্যাদি। উল্টোদিকে হিন্দু ধর্মগুরুরাও মুসলিমদের বিষয়ে ঘৃণা-বিস্তার ও অপপ্রচারে লিপ্ত। এমন কি তাদের শিক্ষা মতে মুসলিমরা তাদের খাবার পাত্র স্পর্শ করলেই খাদ্য 'অভক্ষ' হয়ে যায়। এই রকম বিদ্বেষের শিক্ষা যতদিন প্রচারিত হবে, সাম্প্রদায়িকতার দেওয়াল ভাঙবে না। হৃদয়ের গভীরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জন্ম না নিলে, ধর্মীয় ঐক্যসূত্র সৃষ্টি না করে যতই পাহারা দেয়া হোক, যতই আইন রচনা করা হোক সব উলু বনে মুক্তো ছড়ানো হবে।

আমরা হেযবুত তওহীদ আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করে সেখানে বিভিন্ন ধর্মের বিজ্ঞজন ও সাধারণ মানুষের সামনে প্রামাণচিত্রের মাধ্যমে এবং পত্রিকায় নিয়মিত লিখে, হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা ইত্যাদির

মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচার করে যাচ্ছি। আমরা সকল ধর্মানুসারীদের প্রতি সাধারণ আহ্বান পেশ করছি যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ যেখানে বিপন্ন, সেখানে মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও মনুষ্যত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে যতই এবাদত-বন্দেগী, পূজা-অর্চনা, প্রার্থনা করা হোক সব অর্থহীন। এমন অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের ধর্ম পরিচয়ের কানা পয়সা মূল্যও স্রষ্টার কাছে নেই।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের যোগ কী করে সম্ভব?

এতক্ষণ যে বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য চেষ্টা করলাম তার সারমর্ম হচ্ছে খ্রিষ্টীয় মতবাদের নামে মধ্যযুগীয় নিষ্পেষণ, রাজতন্ত্র আর চার্চের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের (Power struggle and civil war) হাত থেকে বাঁচার জন্য পশ্চিমারা ধর্মকেই সামষ্টিক জীবনের সবগুলো অঙ্গন থেকে পরিত্যাগ করে ধর্মহীন একটা সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। সেই সভ্যতাকে তারা দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। তবে ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়েছে তাদের এই প্রতিষ্ঠা দু দিক থেকেই ব্যর্থ হয়েছে। একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই বড় কথা নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজীবনে শান্তি প্রদান করা। ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা ইউরোপে আমেরকিায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকাংশেই কিন্তু শান্তি দিতে পারে নি। বরং তারাই বাকি দুনিয়ার জন্য অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাতের মূল কারণ হিসাবে প্রতীয়মাণ হচ্ছে। নিজেদের দেশেও তারা ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশ সত্ত্বেও নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তির মধ্যে বাস করে। দ্বিতীয়ত, যাদের ধর্মে জাতীয় জীবনের বিধি বিধান আছে তাদের দ্বারা এই ব্যবস্থা গৃহীতই হয় নি। যেমন মুসলিম, সনাতন, ইহুদিরা হৃদয় থেকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারছে না এবং ধর্মকে যতই বিতাড়িত করা হোক, তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এবং সেই প্রভাবটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই হয় নেতিবাচক।

তাহলে এখন কী করণীয়?

এখন করণীয় হলো যেভাবে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে আবার তা রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এ কথাটি শুনেই যেন কেউ ধরে না নেয় যে আমরা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Theocratic State) এর কথা বলছি। মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র জবরদস্তিমূলক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী হওয়ায় অশান্তিপূর্ণ, তাই সেটা কখনোই ধর্মের শাসন নয়, সেটা ধর্মের নামে ফ্যাসিবাদমাত্র। সেটা আধুনিক বিশ্বে টেকসইও হবে না। এখন যেটা করতে হবে তা হলো, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই ধর্মবিশ্বাসকে রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে হবে। ধর্মবিশ্বাসী জনগণের ঈমানকে আর ব্যক্তি পর্যায়ে বৃত্তবন্দী রাখা যাবে না। রাখলে তা ধর্মব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণেই থেকে যাবে আর ধর্মব্যবসায়ীরা দুই দিন পর পর বিভিন্ন ইস্যু ধরে ফতোয়াবাজি করে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সহিংসতা ও উগ্রতার দিকে নিয়ে যাবে; ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর

উপাদান হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করবে। তাতে সমান্তরালভাবে মুক্তচিন্তার দাবিদার মানুষের ধর্মবিদ্বেষই বৃদ্ধি পাবে ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পাবে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে গোষ্ঠী ও রাজনীতিক স্বার্থ হাসিল করবে। তাই "ধর্ম যার যার - রাষ্ট্র সবার" অথবা "ধর্ম যার যার - উৎসব সবার" ইত্যাদি কথা বলে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করা যাবে না। এমন কি এই কথা বলে ধর্মকে এত সামান্য বিষয় মনে করে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সারা পৃথিবীতে যুগপৎ ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্ম উন্মাদনার একটি জোয়ার বইছে। জঙ্গিগোষ্ঠী গুপ্তহত্যা করছে একের পর এক ধর্মবিদ্বেষী লেখক, ব্লগার, প্রকাশককে। সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডও হচ্ছে, শিয়া-সুন্নী বিভেদও প্রকট হচ্ছে রক্তপাতের মাধ্যমে। ঘৃণাভিত্তিক বিভিন্ন মঞ্চের চেতনাব্যবসা আর ধর্মীয় আবেগভিত্তিক নানা আন্দোলনের জজবার বাড়াবাড়ি এবং এসবের পরিণামে সৃষ্ট রক্তময় ঘটনাগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিনপঞ্জিতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে যা হয়তো অনেকেই এখনো অনুধাবন করতে পারছেন না। সুতরাং ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আর ধর্মজীবী শ্রেণিটির হাতে রাখা যাবে না, রাখলে তা পুনঃ পুনঃ একই রকম দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

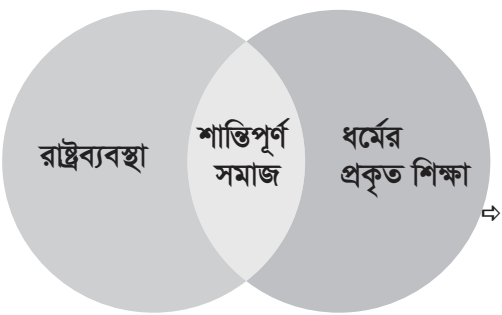

ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা

- ⇨ স্রষ্টার হুকুমের প্রতি আনুগত্য
- ⇨ ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে একজাতি হওয়া
- ⇨ নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণসাধন
- ⇨ দেশ ও জাতির জন্য আত্মোৎসর্গ
- ⇨ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান
- ⇨ যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরাধ
- ⇨ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগতা যা মানুষের অপরাধপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে

ধর্ম আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এ কথাটি বোঝা কঠিন, কেননা ধর্মের কাজ বলতে এখন কেবল দাড়ি, টুপি, জোব্বা, নামাজ, রোজা ইত্যাদিই ধরা হয় আর এগুলোকে রাষ্ট্রের কল্যাণে কী করে ব্যবহার করা যেতে পারে? সেটা হচ্ছে জাতির সামনে ধর্মকে সঠিক রূপে উপস্থাপন করতে হবে। আজ 'রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম' মানেই হচ্ছে দোররা মারা, চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া, নারী নেতৃত্ব হারাম করে দেওয়া, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ, সিনেমা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য এই কু-ধারণা প্রচার করা হয়েছে। এর পেছনে কট্টরপন্থী কিছু মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অতি-বিশ্লেষণকারী ওলামা শ্রেণি দায়ী। এই প্রপাগান্ডার স্বচ্ছ জবাব মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রকৃত ধর্ম জানতে পারলে মানুষ বুঝবে যে দোররা মারা ইত্যাদি ইসলামের উদ্দেশ্য নয়, ইসলামের উদ্দেশ্য মানবসমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা

উপাদান হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করবে। তাতে সমান্তরালভাবে মুক্তচিন্তার দাবিদার মানুষের ধর্মবিদ্বেষই বৃদ্ধি পাবে ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পাবে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে গোষ্ঠী ও রাজনীতিক স্বার্থ হাসিল করবে। তাই "ধর্ম যার যার - রাষ্ট্র সবার" অথবা "ধর্ম যার যার - উৎসব সবার" ইত্যাদি কথা বলে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করা যাবে না। এমন কি এই কথা বলে ধর্মকে এত সামান্য বিষয় মনে করে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সারা পৃথিবীতে যুগপৎ ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্ম উন্মাদনার একটি জোয়ার বইছে। জঙ্গিগোষ্ঠী গুপ্তহত্যা করছে একের পর এক ধর্মবিদ্বেষী লেখক, ব্লগার, প্রকাশককে। সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডও হচ্ছে, শিয়া-সুন্নী বিভেদও প্রকট হচ্ছে রক্তপাতের মাধ্যমে। ঘৃণাভিত্তিক বিভিন্ন মঞ্চের চেতনাব্যবসা আর ধর্মীয় আবেগভিত্তিক নানা আন্দোলনের জজবার বাড়াবাড়ি এবং এসবের পরিণামে সৃষ্ট রক্তময় ঘটনাগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিনপঞ্জিতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে যা হয়তো অনেকেই এখনো অনুধাবন করতে পারছেন না। সুতরাং ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আর ধর্মজীবী শ্রেণিটির হাতে রাখা যাবে না, রাখলে তা পুনঃ পুনঃ একই রকম দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

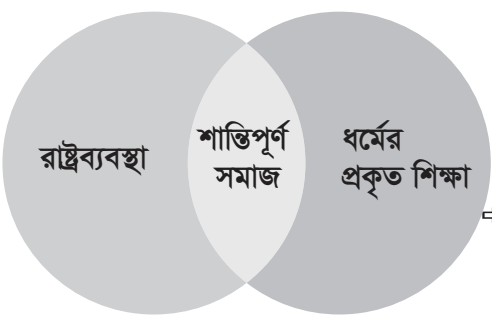

ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা

- ⇨ স্রষ্টার হুকুমের প্রতি আনুগত্য
- ⇨ ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে একজাতি হওয়া
- ⇨ নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণসাধন
- ⇨ দেশ ও জাতির জন্য আত্মোৎসর্গ
- ⇨ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান
- ⇨ যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরাধ
- ⇨ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগতা যা মানুষের অপরাধপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে

ধর্ম আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এ কথাটি বোঝা কঠিন, কেননা ধর্মের কাজ বলতে এখন কেবল দাড়ি, টুপি, জোব্বা, নামাজ, রোজা ইত্যাদিই ধরা হয় আর এগুলোকে রাষ্ট্রের কল্যাণে কী করে ব্যবহার করা যেতে পারে? সেটা হচ্ছে জাতির সামনে ধর্মকে সঠিক রূপে উপস্থাপন করতে হবে। আজ 'রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম' মানেই হচ্ছে দোররা মারা, চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া, নারী নেতৃত্ব হারাম করে দেওয়া, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ, সিনেমা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য এই কু-ধারণা প্রচার করা হয়েছে। এর পেছনে কট্টরপন্থী কিছু মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অতি-বিশ্লেষণকারী ওলামা শ্রেণি দায়ী। এই প্রপাগান্ডার স্বচ্ছ জবাব মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রকৃত ধর্ম জানতে পারলে মানুষ বুঝবে যে দোররা মারা ইত্যাদি ইসলামের উদ্দেশ্য নয়, ইসলামের উদ্দেশ্য মানবসমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা

উপাদান হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করবে। তাতে সমান্তরালভাবে মুক্তচিন্তার দাবিদার মানুষের ধর্মবিদ্বেষই বৃদ্ধি পাবে ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পাবে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে গোষ্ঠী ও রাজনীতিক স্বার্থ হাসিল করবে। তাই "ধর্ম যার যার - রাষ্ট্র সবার" অথবা "ধর্ম যার যার - উৎসব সবার" ইত্যাদি কথা বলে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করা যাবে না। এমন কি এই কথা বলে ধর্মকে এত সামান্য বিষয় মনে করে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সারা পৃথিবীতে যুগপৎ ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্ম উন্মাদনার একটি জোয়ার বইছে। জঙ্গিগোষ্ঠী গুপ্তহত্যা করছে একের পর এক ধর্মবিদ্বেষী লেখক, ব্লগার, প্রকাশককে। সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডও হচ্ছে, শিয়া-সুন্নী বিভেদও প্রকট হচ্ছে রক্তপাতের মাধ্যমে। ঘৃণাভিত্তিক বিভিন্ন মঞ্চের চেতনাব্যবসা আর ধর্মীয় আবেগভিত্তিক নানা আন্দোলনের জজবার বাড়াবাড়ি এবং এসবের পরিণামে সৃষ্ট রক্তময় ঘটনাগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিনপঞ্জিতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে যা হয়তো অনেকেই এখনো অনুধাবন করতে পারছেন না। সুতরাং ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আর ধর্মজীবী শ্রেণিটির হাতে রাখা যাবে না, রাখলে তা পুনঃ পুনঃ একই রকম দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

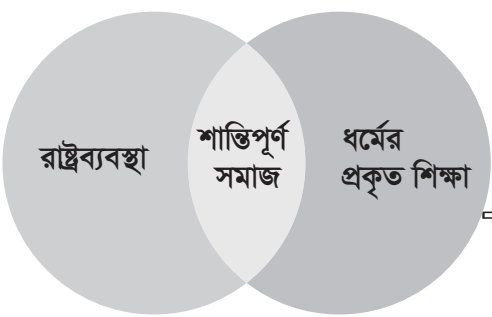

ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা

- ⇨ স্রষ্টার হুকুমের প্রতি আনুগত্য
- ⇨ ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে একজাতি হওয়া
- ⇨ নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণসাধন
- ⇨ দেশ ও জাতির জন্য আত্মোৎসর্গ
- ⇨ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান
- ⇨ যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরাধ
- ⇨ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগতা যা মানুষের অপরাধপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে

ধর্ম আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এ কথাটি বোঝা কঠিন, কেননা ধর্মের কাজ বলতে এখন কেবল দাড়ি, টুপি, জোব্বা, নামাজ, রোজা ইত্যাদিই ধরা হয় আর এগুলোকে রাষ্ট্রের কল্যাণে কী করে ব্যবহার করা যেতে পারে? সেটা হচ্ছে জাতির সামনে ধর্মকে সঠিক রূপে উপস্থাপন করতে হবে। আজ 'রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম' মানেই হচ্ছে দোররা মারা, চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া, নারী নেতৃত্ব হারাম করে দেওয়া, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ, সিনেমা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য এই কু-ধারণা প্রচার করা হয়েছে। এর পেছনে কট্টরপন্থী কিছু মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অতি-বিশ্লেষণকারী ওলামা শ্রেণি দায়ী। এই প্রপাগান্ডার স্বচ্ছ জবাব মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রকৃত ধর্ম জানতে পারলে মানুষ বুঝবে যে দোররা মারা ইত্যাদি ইসলামের উদ্দেশ্য নয়, ইসলামের উদ্দেশ্য মানবসমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা

সৃষ্টি করা। মানুষকে প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা গেলে মানুষ তখন জাতির ক্ষতি হয়, জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ তো করবেই না, বরং প্রতিটি মানুষ জাতির কল্যাণে একেকজন অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হবে। তাদের সামনে জাতির ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোনো কথাও কেউ বলতে সাহস করবে না। এই শিক্ষাও ধর্মেই আছে, কিন্তু সেটাকে চাপা দিয়ে অনেক গুরুত্বহীন বিষয়কে, বহু আপেক্ষিকতার উপর নির্ভরশীল বিষয়কে জল ঘোলা করার জন্য প্রথম লাইনে টেনে আনা হয়েছে। জল ঘোলা করার উদ্দেশ্য কোথাও ধর্মব্যবসা, কোথাও অস্ত্রব্যবসা।

মনে রাখতে হবে যে, একটি সিস্টেম যতই নিখুঁত হোক তা কোনো তা যদি একদল ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর, বদলোকের হাতে পড়ে তাহলে ঐ সিস্টেম মানুষকে শান্তি দেবে না, কারণ তারা ক্ষমতাকে স্বার্থের জন্য ব্যবহার করবে। মানুষ বৈষয়িক দিক থেকে নির্লোভ হবে তখনই যখন সে এই কাজের বিনিময়ে আল্লাহর কাছ বিপুল পুরস্কার লাভ করবে বলে বিশ্বাস করবে। কোনোরূপ বিনিময় ছাড়া কেউ কোনো কাজ করবে এটা মানুষের স্বভাবজাত নয়, আত্মিক প্রেরণা থেকে দু-একজন করতে পারে কিন্তু তা জাতীয়করণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষকে তার প্রকৃত এবাদত ও মানবজীবনের সার্থকতা বোঝানো হলে এখন যেমন তারা ব্যক্তিস্বার্থে জাতির ক্ষতি করে তখন তারা বিপরীত করবে, তারা নিজের সর্বস্ব কোরবানি দিয়ে জাতির সমৃদ্ধির জন্য প্রয়াস করবে। তাদেরকে নেতার আনুগত্যের গুরুত্ব বোঝানো হলে এখন যেমন তারা যে কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনর্থক বিরোধিতা করে সহিংস ঘটনা ঘটায় তখন তারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে কোনো নির্দেশ জাতির কল্যাণার্থে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। এখন যেমন তারা সত্য মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝেও মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষে যায়, তখন তা করবে না। যে কোনো ত্যাগের বিনিময়েও সত্যের পক্ষ নেবে। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে জানবে যে এই কাজের বিনিময় তারা স্রষ্টা থেকে লাভ করবে। এখন তারা যেমন ক্ষুদ্র লাভের জন্য খাদ্যে বিষ মেশায়, ঔষধে ভেজাল দেয়, খুন, হত্যা, ষড়যন্ত্র, গুম ইত্যাদি চালায় তখন তারা সেটা আর করবে না। অর্থাৎ সৎ মানুষ তৈরি হবে, মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পেলে সমাজও অপরাধমুক্ত হবে। তখন মানুষ তারা চাকুরিসুলভ মানসিকতা পরিহার করে নিজেরেদকে মানবতার কল্যাণে উদ্দীপ্ত করবে এবং সম্মিলিত সচেতন প্রয়াসে জাতিকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। জাতির মধ্যে এই জাগরণ সৃষ্টি করতে হলে তাদের ধর্মবিশ্বাসকেই কাজে লাগাতে হবে। কেননা যে কাজগুলোর কথা বললাম এ সবগুলো কাজের প্রবণতা সৃষ্টির উপাদান ধর্মের মধ্যে রয়েছে। না লাগানো হলে ধর্ম মানুষের কোনো কল্যাণেই লাগবে না, উল্টো ধর্মব্যবসায়ীদের অঙ্গুলি হেলনে অকল্যাণেই লাগবে।

এখন সেগুলি কে মানবজাতিকে প্রদান করবে? সেটা করার জন্যই হেযবুত তওহীদ। এই ধারণাগুলো আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। কারণ এই সৃষ্টি আল্লাহর, এই পৃথিবীও আল্লাহর। এই পৃথিবী ও মানবজাতি যখন ধ্বংসের

পরিস্থিতিতে চলে যায়, সমস্যা এমন ঘনীভূত হয় যে মানুষ কোনোক্রমেই আর সেখান থেকে বেরোতে পারে না, তখন আল্লাহ স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেন। তিনিই কোনো না কোনো উপায়ে তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করেন, সৃষ্টিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। এই সুরক্ষা তিনি মানুষদের মধ্য দিয়েই করেন। হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা প্রকৃত রূপ দান করেছেন। আমরা জাতির কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে আসন্ন এই মহা বিপর্যয় ও সংকট থেকে রক্ষার জন্য সকল নবী রসুলের আনীত ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে চাই। শুধু চাই-ই না, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি তুলে ধরার। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য যে, এই কাজে আমাদের কোনো বৈষয়িক স্বার্থ, কোন ভিন্ন অভিপ্রায় নাই। আমরা জানি যে, এটা আল্লাহর প্রকৃত ইসলামের কাজ, তাই আমরা আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান অবশ্যই পাব।

কাজেই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও সর্বস্তরের মানুষকে আমাদের সম্পর্কে জানার ও বোঝার জন্য আহ্বান করছি। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে আমাদের সম্পর্কে সঠিক ও সত্য জানুন। তারপর গ্রহণ করার মতো হলে গ্রহণ করুন, না হলে প্রত্যাখ্যান করুন। কিন্তু অস্পষ্ট বা ভুল ধারণা যেন না থাকে। গণমাধ্যমের প্রতিও এই কথা। তাদের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের দ্বারা এই সত্যগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরে জাতির জীবনরক্ষায় ভূমিকা রাখুন।

শেষ কথা

মানবজাতির মধ্যে যত প্রকার অশান্তি বিরাজ করে তার মূল কারণ একটি নিখুঁত জীবনব্যবস্থার অভাব। বর্তমানে জীবনব্যবস্থার নির্মাতা যেহেতু পশ্চিমা 'সভ্যতা' দাজ্জাল, তাই তারাই সকল অশান্তির মূল কারণ। তারা মানবজাতি ও মানবতার মূল প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করা সমসময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা এতটাই প্রতারক যে তাদেরকে মানুষ শত্রু নয়, মিত্রও নয় একেবারে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছে। তারা গরু মেরে জুতা দান করলে আমরা সে জুতায় চুমু খাই আর ভাবি আরেক পাটি জুতা কবে জুটবে। আমাদেরকে এই হীনম্মন্যতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শত্রু-মিত্র চিনতে হবে। পশ্চিমারা গত ২০০ বছরে শত শত ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে পৃথিবীর পরিবেশ, জলবায়ুকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। কত কোটি মানুষ হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি চাপিয়ে দিয়ে আজো আমাদেরকে ঐক্যহীন করে একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন করে রেখেছে। কোনো ইস্যুতেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না। তারা আধুনিক, তাই তাদেরকে অনুসরণ না করে উপায় নেই - এ কথার ভিত্তিতে আমরা তাদের অনুসরণ করে যাচ্ছি। কিন্তু যাচ্ছি কোথায় সেটাও তো দেখতে হবে। আমি কি তাদের অনুসরণ করতে করতে নিজের দেশটাকেই ধ্বংস করে ফেলব, আমি কি তার পেছন পেছন গিয়ে সাগরে ডুবে মরব, উদ্বাস্তু হব? সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে নিতে হবে।